কালো যাদুকর
হুমায়ূন আহমেদ

ভূমিকা

আমি যা বিশ্বাস করি তাই লিখি।

অবিশ্বাস থেকে কিছু লিখতে পারি না। আমার বিশ্বাসের জগৎটা আবার খুবই বিচিত্র। সেই বিচিত্র বিশ্বাসের একটা গল্প লিখলাম। গল্পটিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করাই ভাল হবে।

হুমায়ূন আহমেদ
৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

পৌষের শুরু।

জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সবাই বলাবলি করছে—গত বিশ বছরে এমন শীত পড়েনি। এ বছর বুড়ো মরা শীত পড়েছে, এই শীতে দেশের সব বুড়োবুড়ি মরে যাবে।

প্রতি শীতেই এ-জাতীয় কথা লোকজন বলে। তবে এবারের কথাটা বোধ হয় সত্যি। নেত্রকোনা বিউটি বুক সেন্টারের মালিক মবিন উদ্দিনের তাই ধারণা।

মবিন উদ্দিনের গায়ে ফুল-হাতা সোয়েটার। লাল রঙের মাফলারে মাথা কান সব ঢাকা। তারপরেও "বাড়তি সাবধানতা" হিসেবে ট্রাঙ্ক থেকে পুরানো একটা শাল বের করে তিনি গায়ে দিয়েছেন। শাল থেকে ন্যাপথলিনের বিকট গন্ধ আসছে। গন্ধ আগে টের পাওয়া যায়নি, রাস্তায় নেমে টের পেলেন। তাঁর গা গুলাতে লাগলো। তাঁর গন্ধ বিষয়ক সমস্যা আছে। কড়া কোন গন্ধই সহ্য হয় না। শুরুতে গা গুলাতে থাকে, তারপর মাথা ধরে, বমি বমি ভাব হয়। একবার কী মনে করে কাঁঠাল চাঁপা ফুলের গন্ধ শুঁকেছিলেন। গন্ধটা সাঁই করে মাথার ভিতর ঢুকে গেল। তারপর কী যে অবস্থা। তিনি বমি করতে শুরু করলেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটবার বমি করে চোখ-টোখ উল্টে বিছানায় পড়ে গেলেন। ডাক্তার আনতে হলো, স্যালাইন দিতে হলো। হুলুস্থুল ব্যাপার।

শাল থেকে এত কড়া ন্যাপথলিনের গন্ধ আসবে জানলে তিনি ভুলেও শাল গায়ে দিতেন না। বড় বড় ভুল মানুষ জেনেশুনে করে না, নিজের অজান্তে করে। গন্ধওয়ালা শাল গায়ে দেয়া তাঁর জন্যে বড় ধরনের ভুল। শুরুতে ভুলটা ধরা পরে নি, কারণ তাঁর নাক ঢাকা ছিল মাফলারে। নাকে গন্ধ যেতে পারছিল না। রাস্তায় নেমে বড় গাঙ্গের বাঁধের উপর নতুন রাস্তায় ওঠার পর নাক থেকে মাফলার সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁই করে ন্যাপথলিনের গন্ধ তাঁর নাকের ভেতর দিয়ে একেবারে মগজে ঢুকে গেলো। তিনি কী করবেন ভেবে বের করতে পারলেন না। অর্ধেকের বেশি পথ চলে এসেছেন। আবার বাসায় ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। শালটা খুলে রাস্তায় ফেলে দেয়া যায় না। তিনি দরিদ্র মানুষ। তাঁর অল্প কিছু

দামী জিনিসপত্রের একটা হচ্ছে এই শাল। উনিশ বছর আগে বিয়েতে তাঁর এক মামাশ্বশুর দিয়েছিলেন। উনিশ বছরেও শালটার কিছু হয়নি। পৌষের এই প্রচণ্ড শীতে শাল গায়ে দেয়ার জন্যেই তাঁর মোটামুটি গরম লাগছে। শুধু গন্ধটা কষ্ট দিচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করা শুরু হয়েছে। গা এখনো গুলাতে শুরু করেনি। তবে শুরু করবে। কে জানে রাস্তার পাশে বসেই হয়তো বমি শুরু করতে হবে। এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ। হাস্যকর কোন রোগ। তবে হাস্যকর হলেও এই রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত। রোগটা সারাজীবন তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

মবিন উদ্দিন দ্রুত হাঁটছেন। সূক্ষ্ম চেষ্টা চালাচ্ছেন গন্ধকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে। লাভ হচ্ছে না, গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে আসছে। নাক বন্ধ করে তিনি এখন মুখে শ্বাস নিচ্ছেন। কাজটা ভুল হচ্ছে, এতে বুকে দ্রুত ঠাণ্ডা লেগে যায়। তিনি যাচ্ছেন নেত্রকোনা রেল স্টেশনের উত্তরে বৈদ্যহাটা—তাঁর ছোট বোন রাহেলার বাসায়। রাহেলার বড় মেয়ে মিতুর বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র পক্ষের কয়েকজন আসবে। চা-টা খাবে, পাকা কথা হবে। তাঁর উপস্থিত থাকা অত্যন্ত জরুরি। জরুরি না হলে তিনি বেরুতেন না। কয়েকদিন ধরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। রোজ সন্ধ্যার দিকে গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। মনে হয় ম্যালেরিয়া। লোকজন যে বলছে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া চলে গেছে এটা ঠিক না। কিছুই পুরোপুরি চলে যায় না, সবকিছু ফিরে ফিরে আসে। ম্যালেরিয়া আবার ফিরে এসেছে, এবং তাঁকে শক্ত করে ধরেছে।

মবিন উদ্দিন বাঁধের রাস্তা ছেড়ে মাছ-পট্টি দিয়ে বাজারে ঢুকে গেলেন। বাজার থেকে রিকশা নেবেন। তাঁর হাঁটতে ভাল লাগছে না, ভাল লাগলে হাঁটতে হাঁটতেই যেতেন। কিছু এক্সারসাইজ হত। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো। এই বয়সে হাঁটাহাঁটির মতো এক্সারসাইজ অত্যন্ত জরুরি। হাঁটা-হাঁটি একেবারেই হচ্ছে না। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বইয়ের দোকানে বসে বসে শরীর ধ্বসে গেছে। তাও যদি বিক্রি-বাটা হত একটা কথা ছিল, কোন বিক্রি নেই। বইয়ের দোকান না দিয়ে একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকান দিলে হত। রমরমা ব্যবসা। একেক সময় একেক জিনিসের সিজন আসে, এখন ভিডিও ক্যাসেটের সিজন।

রাত আটটার মতো বাজে। প্রচণ্ড শীতের কারণেই বোধ হয় বাজারের বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। নিধু সাহার কাপড়ের দোকানটা খোলা। ক্যাশ বাক্সের সামনে নিধু সাহা বিরস মুখে বসে আছে। বিক্রি বাটা মনে হয় ভাল না। মাছ-পট্টির সামনে চায়ের স্টলটা খোলা। সেখানে হিন্দি গান হচ্ছে—"মেরা

==

বাচপান চলা গিয়া।" কয়েকজন কাস্টমার বসে বসে বিরক্ত মুখে চা খাচ্ছে। হিন্দি গান তাদের বিরক্তি দূর করতে পারছে না।

চায়ের স্টলে হিন্দি গান ছাড়া অন্য গান বাজানো হয় না কেন ভাবতে ভাবতে রিকশার খোঁজে মবিন উদ্দিন এদিক ওদিক তাকালেন। কোন রিকশা নেই। চারদিক পুরোপুরি ফাঁকা। এই শীতে কোন রিকশাওয়ালাই বোধ হয় রিকশা বের করেনি। সবাই কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

মবিন উদ্দিনের মনে হল মাছ-পট্টিতে ঢুকে তিনি আরেকটা বড় ভুল করেছেন। তীব্র ও বিকট মাছের গন্ধে তাঁর প্রায় দম আটকে আসছে। মাছ-পট্টিতে মাছ নেই, কিন্তু মাছের গন্ধ রয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ গন্ধের একটা হল কাচা মাছের গন্ধ। এই গন্ধ নাকে নিয়ে লোকজন চা খাচ্ছে কী করে তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি মাথার মাফলার খুলে নাকে চেপে দ্রুত হাঁটছেন। মাছ-পট্টি ছাড়ালেই দরজি-পট্টি। আর একটু এগুলেই বড় রাস্তায় পড়বেন। বড় রাস্তায় রিকশা পাওয়া যাবে। রিকশা নিয়ে নেত্রকোনা বড় স্টেশনে চলে যাবেন, সেখান থেকে বিশ পঁচিশ গজ গেলেই রাহেলার বাসা।

দরজি-পট্টির মোড়ে এসে মবিন উদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন। বেশ কিছু লোকজন একটা লাইট পোস্টের কাছে ভিড় করে আছে। বাজারের ভেতর কয়েকটা লাইটপোস্ট, কিন্তু কোনোটাতে আলো নেই। এই একটাতেই টিউব লাইট জ্বলছে। সেই আলোয় মজাদার কিছু বোধ হয় হচ্ছে। মজা ছাড়া এই শীতে এতগুলি মানুষ জড় হবে না। লোকজন বেশি থাকলে হৈ চৈ সাড়াশব্দ হয়। এখানে কোন শব্দ নেই। মনে হচ্ছে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে কী যেন দেখছে। তিনিও উঁকি দিলেন।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখার মতো কিছু না। একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। বিস্ময়কর কোন ম্যাজিকও না। বেদেরা যেমন ফালতু ধরনের ম্যাজিক দেখায় সেরকম, হাতে একটা বল থাকে, একটা বল থেকে দু'টা হয় তিনটা হয় আবার সব বল শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই লোকের ম্যাজিকও সেরকমই। শুধু তার হাতে বল নেই। আছে পুতুল। ছোট ছোট পুতুল। পুতুলগুলি দেখতে খুব সুন্দর। একেবারে ঝক ঝক করছে। একটা পুতুল থেকে দু'টা হচ্ছে, তিনটা হচ্ছে আবার একটা হয়ে যাচ্ছে। এই হল খেলা। খুবই ফালতু।

এতগুলি মানুষ হাড় কাঁপানো শীতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ম্যাজিক দেখছে কেন মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না। এমন না যে এরা কোনদিন ম্যাজিক দেখেনি। নেত্রকোনা বেশ বড় শহর। নানান ধরনের রং তামাশা এই শহরে দু'দিন পর পর

==

হচ্ছে। এইতো কয়েক দিন আগে মৃত্যু কূপ বলে একটা ব্যাপার হয়ে গেলো। একটা ছেলে কুয়া কেটে তার ভেতর চোখ বেঁধে মোটর সাইকেল চালিয়েছে। খুবই নাকি ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি দেখতে পারেননি। পাঁচ টাকা করে টিকেট করেছিল। অকারণে পাঁচটা টাকা খরচ করতে মায়া লাগলো। পথের উপর ম্যাজিক দেখার একটা সুবিধা হল টিকিট কাটতে হয় না। এই লোকের পুতুলের খেলা তিনিও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন।

মবিন উদ্দিন ম্যাজিক দেখার জন্যে দাঁড়ালেন। আবার ঠিক যে ম্যাজিক দেখার জন্যে দাঁড়ালেন, তাও না। দ্রুত হেঁটে আসায় বুকে হাঁপ ধরে গিয়েছিল। তিনি দাঁড়ালেন খানিকটা বিশ্রামের জন্যে। লোকটার ম্যাজিক শুরুতে যতটা খারাপ ভেবেছিলেন ততটা খারাপ না। বেদেরা একটা বল দু'টা করার সময় হাতের মুঠি বন্ধ করে। এই লোক তা করছে না। তার খোলা হাতের তালুতে পুতুলটা বসানো। সেখানেই একটা পুতুল দু'টা হচ্ছে, তিনটা হচ্ছে। যা ঘটছে চোখের সামনেই ঘটছে। কীভাবে ঘটছে কে জানে! তিনি কোথায় যেন পড়েছিলেন, যে ম্যাজিক যত বিস্ময়কর সে ম্যাজিকের ভেতরের কৌশল তত সহজ। এই লোকের পুতুলের ম্যাজিকের কৌশলও হয়ত খুব সহজ। অন্য পুতুল দু'টা নিশ্চয়ই হাতের তালুর পেছনেই লুকানো, দেখা যায় না এমন কোন সুতা দিয়ে বাঁধা। একটা পুতুল চোখের সামনে দু'টা হয়ে যাচ্ছে, তিনটা হয়ে যাচ্ছে। লোকটা হাতের মুঠি পর্যন্ত বন্ধ করছে না। আশ্চর্য তো! মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। হিপনোটিজম! চোখের ধান্ধা ?

ম্যাজিশিয়ান রোগা এবং লম্বা। গায়ের রং কালো, বেশ কালো। মাথার চুল নিগ্রোদের চুলের মতো কোঁকড়ানো। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পৌষ মাসের এই প্রচণ্ড শীতে লোকটা বলতে গেলে বিনা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে গোলাপী রং এর পাতলা একটা সুতির সার্ট। পরনে পায়জামা। খালি পা। এই পোষাকে কার্তিক মাসের শীত মানার কথা না, পৌষ মাসের শীত কি মানবে ? বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। তিনি নিজে ফুল হাতা সোয়েটারের উপর শাল চাপিয়েও শীত মানাতে পারছেন না। শালের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দরিদ্র হওয়ার কী কষ্ট। এই প্রচণ্ড শীতে বেচারাকে প্রায় খালি গায়ে ম্যাজিক দেখাতে হচ্ছে। ম্যাজিক শেষ হবার পর সে সবার কাছে হাত পাতবে। ভিক্ষা চাইবে। কষ্ট করে খেলা দেখানোর পরেও তাকে ভিক্ষুকদের মতো নতজানু হয়ে কৃপা প্রার্থণা করতে হবে। মবিন উদ্দিন তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন। দু'টা পাঁচ টাকার নোট খচখচ করে উঠল। না পাঁচ টাকা দেয়া যায় না। এক

==

টাকা দু'টাকা হলে দেয়া যেত। পাঁচ টাকা অনেক টাকা। মবিন উদ্দিনের একটু মন খারাপ হল। বেশির ভাগ লোকই তাঁর মতো আচরণ করবে। খেলা শেষ হবার পর কিছু না দিয়েই চলে যাবে। তার জন্যে লজ্জিতও বোধ করবে না। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে দেখে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অন্যের কষ্টে এখন আর কেউ লজ্জিত বোধ করে না। মবিন উদ্দিন লজ্জা ও অস্বস্তি নিয়ে ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকালেন।

আশ্চর্য! ম্যাজিশিয়ানও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। চোখে পলক পর্যন্ত ফেলছে না। তার চোখ বড়বড়, এবং হাসি হাসি। যেন সে মবিন উদ্দিনকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে। মবিন উদ্দিন যে তাকে পাঁচটা টাকা দিতে গিয়েও দিচ্ছেন না তা বুঝে ফেলেছে। মবিন উদ্দিনের একটু অস্বস্তি বোধ হল। একদল লোকের সামনে কেউ যখন ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখায় তখন সে বিশেষ কারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে না। সবার দিকেই তাকায় কিংবা কারোর দিকেই তাকায় না। যখন বিশেষ কারো দিকে তাকায় তখন ধরেই নিতে হয় ম্যাজিশিয়ানের কোন বদ মতলব আছে। এমন কোন ম্যাজিক তাকে নিয়ে যে করবে সে অপমানের চূড়ান্ত হবে। অন্যরা সেই অপমান দেখে খুব মজা পাবে। এই বিষয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বছর দশেক আগে কী একটা কাজে গৌরীপুর গিয়েছিলেন। দিনে দিনে কাজ শেষ করে রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা ফেরার জন্যে স্টেশনে এসে বসে আছেন। রাত বারোটায় ট্রেন, বাজছে মাত্র ন'টা। সময় আর কাটতেই চাচ্ছে না। সময় কাটানোর জন্যে তিনি গৌরীপুর জংশনের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাটি করছেন। হঠাৎ দেখলেন এক জায়গায় ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। চেংড়া মতো এক ম্যাজিশিয়ান তাসের খেলা, পিংপং বলের খেলা দেখাচ্ছে। খুব হাততালি পড়ছে। তিনিও কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালেন। সেই দাঁড়ানোই কাল হল। চেংড়া ম্যাজেশিয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বলল, ভাইজান একটু সামনে বাড়েন। তিনি এগুলেন। ম্যাজিশিয়ান তাঁর হাত ধরে বলল, ভাইজানের নাম কি ?

তিনি তখন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন, তাকে নিয়ে রসিকতা শুরু হয়ে গেছে। তাঁর বিব্রত ভঙ্গি দেখে দর্শক হাসতে শুরু করেছে। কোন বুদ্ধিমান ম্যাজিশিয়ানই দর্শকদের হাসানোর এই সুযোগ নষ্ট করবে না। চেংড়া ম্যাজিশিয়ানও করল না। মধুর গলায় বলল, বলেন ভাইজান বলেন। নাম বলেন। বুলন্দ আওয়াজে বলেন।

তিনি নাম বললেন। ততক্ষণে তাঁর কপাল ঘামতে শুরু করেছে। পা কাঁপছে। একী বিপদে পড়া গেল!

===

'আচ্ছা ভাইজান সত্যি কইরা বলেন দেহি আপনি মানুষ না মুরগী ?'

এই অপমানকর, হাস্যকর প্রশ্নের তিনি কী জবাব দেবেন ? ভয় এবং আতংকে তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ম্যাজিশিয়ান ফিস ফিস করে বলল, মুরগী হইলে কোঁকর কোঁ কইরা একটা ডাক দেন। দেন ডাক দেন।

কোঁকর কোঁ করে ডাক দেবার বদলে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। ম্যাজিশিয়ান তার হাত ধরল, কানের কাছে মুখ নিয়ে গানের মতো করে বলল,

মুরগী বলে কোঁকর কোঁ
মোরগ বলে কী গো ? তোমার হইছে কী ?

দর্শক হেসে প্রায় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহ্ তুমি আমাকে একী অপমানের মধ্যে ফেললে ?

অপমানের তখন মাত্র শুরু। এরপর যা আরম্ভ হল তা ভাবলে তিনি এখনো শিউরে ওঠেন। চেংড়া ম্যাজিশিয়ান তাঁর পাঞ্জাবির পেছনে হাত দিয়ে একটা ডিম বের করে নিয়ে এল। তারপর ডিম আনতেই শুরু করল। একসময় গম্ভীর গলায় বলল, ভাইজান দেহি বিলাতী মুরগী। ডিম পাড়তেই আছে পাড়তেই আছে।

পুতুল হাতে এই যাদুকর চেংড়া ম্যাজিশিয়ানের মতো না। সে তাঁর দিকে এখনও তাকিয়ে আছে। সেই তাকানোয় মমতা আছে। তার চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে—সে কাউকে অপমান করবে না। কয়েকটা পুতুল নিয়ে মজার কিছু খেলা দেখাবে। সম্ভবত টাকা পয়সাও চাইবে না। কেউ দিলে দেবে, না দিলে না।

ম্যাজেশিয়ানদের নিয়মই হচ্ছে বকবক করা। অকারণে কথা বলে লোকজনদের বিভ্রান্ত করা। এই লোক তাও করছে না। মবিন উদ্দিন অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছেন এখন পর্যন্ত তিনি ম্যাজিশিয়ানের কোন কথা শোনেননি। এই যাদুকরের গলার স্বর নিশ্চয়ই গৌরীপুরের চেংড়া ম্যাজিশিয়ানের মতো কর্কশ না। তার গলার স্বর শুনতে পারলে ভাল লাগতো। যাদু দেখানো শেষ হলে সে এক সময় কথা বলবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। এম্নিতেই দেরি হয়ে গেছে। আরে আরে একী! পুতুলগুলি দেখি বেলী ফুল হয়ে গেছে। ম্যাজিশিয়ানের হাত ভরতি বেলী ফুল। আর কী গন্ধ ফুলের। তিনি এতদূর থেকেও গন্ধ পেলেন।

মবিন উদ্দিন বড় রাস্তার দিকে রওনা হলেন। তাঁর মন একটু খুঁত খুঁত করতে লাগলো, যাদুকরকে পাঁচটা টাকা দিয়ে এলেও পারতেন। এই প্রচণ্ড শীতে বেচারা শুধু পাতলা একটা সার্ট গায়ে দিয়েছিল। আহারে।

==

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার মবিন উদ্দিন লক্ষ্য করলেন না। তাঁর গন্ধ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তিনি ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধ পাচ্ছেন না। তাঁকে নর্দমা টপকে যেতে হল। যেখানে একটা কুকুর মরে গলে পড়ে আছে। তার পচা শরীর থেকে বিকট গন্ধ আসছে। তিনি সেই বিকট গন্ধও পেলেন না। তাঁর নাকে বেলী ফুলের মিষ্টি সৌরভ লেগে রইল।

বিয়ের আলাপ শেষ হল রাত এগারোটায়। মবিন উদ্দিনের বিরক্তির সীমা রইল না। একই কথা ছ'বার সাত বার করে বলা হচ্ছে। সামান্য একটা তারিখ ঠিক করা নিয়ে এত কথা বলারই বা কী আছে?

বিয়ের তারিখ ঠিক হল মাঘ মাসের ৯ তারিখ, শুক্রবার। জুমার নামাজের পর এজিন কাবিন হবে। চল্লিশ হাজার টাকা কাবিন, অর্ধেক জেওরপাতিতে উসুল। ছেলেকে দিতে হবে একটা মোটর সাইকেল আর কিছু না। মোটর সাইকেলের তার নাকি খুব শখ। মোটর সাইকেলের বাইরে যদি মেয়ের বাবা-মা শখ করে কিছু দিতে চায় দিবে। তবে পাত্র পক্ষের কোন দাবী নাই।

আলোচনার শেষে খাওয়া দাওয়া। কোরমা, পোলাও, ঝাল গোসত, ফিরনি। প্রচুর আয়োজন। রাহেলার রান্না ভাল। মবিন উদ্দিন আরাম করে খেলেন। ঘরে ফেরার জন্যে যখন উঠলেন তখন রাত বাজে বারোটা।

রাহেলা বলল, ভাইজান রাতটা থেকে যান। শীতের মধ্যে কোথায় যাবেন?

মবিন সাহেব থেকে যেতে পারতেন। বাসায় বলেও এসেছেন বেশি দেরী হলে থেকে যাবেন। থেকে গেলে তাকে নিয়ে বাসায় কেউ দুঃশ্চিন্তা করবে না। কিন্তু থাকতে ইচ্ছা করছে না। কেন জানি অস্থির লাগছে।

এত রাতে রেল স্টেশন ছাড়া কোথাও রিকশা পাওয়া যাবে না। মবিন উদ্দিন রেল স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

বাইরে কনকনে হাওয়া বইছে। মবিন উদ্দিনের মনে হল গত কুড়ি বছরে না, চল্লিশ বছরেও নেত্রকোনায় এত শীত পড়েনি। রাহেলার বাড়িতে রাতটা থেকে গেলেই হত। এত রাতে বের হওয়া বোকামী হয়েছে। এই বয়সে বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে সমস্যা হবে।

মবিন উদ্দিন কোন রিকশা পেলেন না। একজন বুড়ো রিকশাওয়ালা পাওয়া গেলো সে এত দূরের পথে যাবে না। তিনি যখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন রাতটা রাহেলার বাসাতেই কাটাবেন তখনই কালো যাদুকরকে দেখলেন। টিকিট ঘরের সিড়িতে বসে আছে। হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই। তাকে ঠিক

==

আগের মতো লাগছে না। একটু যেন অন্য রকম লাগছে। আগে গায়ে গোলাপী রঙের সার্ট ছিল। এখন সার্টের রঙ মনে হল নীল। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। এখন সেরকম মনে হচ্ছে না। বয়সও অনেক কম মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী? মবিন উদ্দিন কালো যাদুকরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতস্ততঃ করে বললেন, দরজি পট্টিতে তুমি কি ম্যাজিক দেখাচ্ছিলে ?

সে হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে হাসল।

'তোমার নাম কি ?'

সে আবারো হাসল।

আচ্ছা ছেলেটাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে গেলে কেমন হয় ? বাসায় নিয়ে চারটা গরম ভাত খাইয়ে দেয়া। তাকে বললে সে কি যাবে ? মনে হচ্ছে যাবে। মবিন উদ্দিন ইতস্তত করতে লাগলেন।

অচেনা একজন মানুষকে দুপুর রাতে হুট করে বাড়িতে নিয়ে আসা যায় না। তাছাড়া পথে ঘাটে যারা ম্যাজিক দেখায় তারা খুব সুবিধার মানুষ হয় না। ধান্ধাবাজ মানুষই ম্যাজিশিয়ান হয়। এরা দিনে ম্যাজিক দেখায় রাতে চুরি চামারি করে। ছেলেটাকে অবশ্যি ধান্ধাবাজ মনে হচ্ছে না। ধান্ধাবাজ মানুষ কথা বেশি বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হড়হড় করে কথা বলে। এই ছেলে কথা বলছেই না। বোবা-কালা নাতো ? নিশ্চিত হবার জন্যে মবিন উদ্দিন আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

সে জবাব দিল না। মাথা নিচু করে হাসল। মবিন উদ্দিন বললেন, কথা বলতে পার না ?

'পারি।'

'পার তাহলে কথা বলছ না কেন ?'

সে আবারো হাসল। ছেলেটার হাসি সুন্দর। ধান্ধাবাজ মানুষ সুন্দর করে হাসতে পারে না তাদের হাসির মধ্যেও একটা কিন্তু থাকে। আচ্ছা ছেলেটাকে বইয়ের দোকানে একটা চাকরি দিয়ে দিলে কেমন হয়? সেলসম্যান। পেটে ভাতে থাকবে। মাঝে মধ্যে কিছু হাত খরচ। না বইয়ের দোকানের চাকরি দেয়া যাবে না। বইয়ের দোকানে চাকরি করতে হলে পড়াশোনা জানতে হয়। পথে ঘাটে যারা ম্যাজিক দেখায় তারা পড়াশোনা জানে না। তারা ক অক্ষর গুকর মাংস টাইপ হয়।

'তুমি কি লেখা পড়া কিছু জান ? বই পড়তে পার ?'

==

ছেলেটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। মবিন উদ্দিনের মনটা ভাল হয়ে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, তোমার ম্যাজিক দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। ভাল ম্যাজিক। যাই হোক তুমি কী খাওয়া দাওয়া কিছু করেছ ?'

ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়ল। মবিন উদ্দিনের মনে হল প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। একটা মানুষ এত রাত পর্যন্ত না খেয়ে বসে আছি এটা জানার পর তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না। সারা পৃথিবীতে বহু লোক রাতে না খেয়ে ঘুমুতে যায়। তাতে আমাদের খারাপ লাগে না কারণ আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি না সে খেয়েছে কি না।

'তোমার শীত লাগছে না ?'

সে না সূচক মাথা নাড়ল। এই প্রচণ্ড শীতে হাফসার্ট গায়ে দিয়ে সে বসে আছে আর বলছে, 'শীত লাগছে না।'। এটা একটা কথা হল। শীত অবশ্যই লাগছে। স্বীকার করছে না। গায়ের শালটা কি তাকে দিয়ে দেবেন? এটা কি ঠিক হবে ? না ঠিক হবে না। সুরমা জানতে পারলে হৈ চৈ করে বাড়ি মাথায় তুলবে। বরং তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। বাড়িতে নিয়ে পুরানো চাদর টাদর কিছু দিয়ে দিলেই হবে। চারটা ভাত খাইয়ে, একটা চাদর দিয়ে বিদায়। সেলসম্যানের চাকরি দিয়ে বাড়িতে রেখে দেয়া ঠিক হবে না। এমনিতেই সংসার চলে না। আরেকটা বাড়তি মুখ।

মবিন উদ্দিন গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন, তুমি চল আমার সঙ্গে।

ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। দেরি করল না। যেন সে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই বসে ছিল।

'তোমার নাম কী তাতো এখনো জানা হল না।'

'টুনু।'

'কি বললে নাম ?'

'টুনু।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

মবিন উদ্দিন বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। টুনু তাঁর বড়ছেলের নাম, পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। পাঁচ বছর দীর্ঘ সময়— প্রায় অর্ধযুগ, তবু মনে হয় এইতো সেদিন। সবকিছু ছবির মতো ভাসে।

টুনু নেত্রকোনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়তো। হঠাৎ খবর এল তার প্রচণ্ড পেটে ব্যথা। কলেজ থেকে তাকে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন সন্ধ্যা। তার নিজের শরীর ভাল লাগছে না বলে আগে ভাগে দোকান বন্ধ

==

করে ঘরে ফেরার কথা ভাবছেন। তখনি খবরটা এল। তিনি হাসপাতালে ছুটে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হল না। তাঁকে বলা হল কিছুক্ষণ আগে এপেনডিক্স অপারেশন হয়েছে। সে আছে পোস্ট অপারেটিভ রুমে। জ্ঞান ফেরেনি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে। পোস্ট অপারেটিভ রুমে কারোর প্রবেশ নিষেধ। তিনি হাসপাতালের বারান্দায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন ডাক্তার এসে সান্ত্বনা দিলেন—আপনি এত নার্ভাস হয়ে গেছেন কেন। এপেনডিক্স অপারেশন কোন ব্যাপারই না। ফোঁড়া কাটার মতো। পার্থক্য একটাই—এই ক্ষেত্রে ফোঁড়াটা শরীরের ভেতরে। যান এক কাপ চা খেয়ে এসে খোঁজ নিন। ততক্ষণে ছেলের জ্ঞান ফিরে আসবে। তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তিনি চা খেতে গেলেন। ফিরে এসে শুনলেন ছেলে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে ফিস ফিস করে বলেছিল, বাবা আসেনি? বাবা ?

চা খেতে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হতো। সামান্য এক কাপ চায়ের জন্যে ছেলের সঙ্গে তার শেষ দেখা হল না।

এরপর থেকে তিনি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আজ প্রায় ছয় বছর হল তিনি চা খান না।

যাদুকরের নামও টুনু। এটা কি বিস্মিত হবার মতো কোন ঘটনা ?

না বিস্মিত হবার মতো কোন ঘটনা না। টুনু খুব কমন নাম—অনেকেরই থাকে। টুনটুনি থেকে টুনু। এই যাদুকরের বাবা-মা ছেলের নাম টুনু রেখেছেন। তাহলে তিনি এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন ? সমস্যাটা কী ?

মবিন উদ্দিন রিকশায় উঠে সমস্যা ধরতে পারলেন। তিনি বুকের ভেতর এক ধরনের কাঁপন অনুভব করলেন। যাদুকরের সঙ্গে কোথায় যেন টুনুর একটা মিল আছে। মিলটা কোথায় ? টুনুর গায়ের রং ছিল ধবধবে শাদা। রূপকথার বই-এ দুধে আলতা রং বলে একটা কথা পাওয়া যায় অবিকল সেই ব্যাপার। নজর লাগবে বলে তার মা অনেক বয়স পর্যন্ত তার কপালে এত বড় একটা কাজলের টিপ দিয়ে রাখতো। যাদুকরের গায়ের রং কুচকুচে কালো। টুনু সারাক্ষণ বকবক করতো তার কথার যন্ত্রণায় তিনি নিজে কতবার বলেছেন— একজন জুতা সেলাইওয়ালা ডেকে টুনুর মুখটা সেলাই করে দেয়া দরকার। আর এদিকে যাদুকর ছেলেটা কথাই বলে না। যে কোন প্রশ্ন দু'তিন বার করে করতে হয়। চেহারায় কি কোন মিল আছে ? না চেহারাতেও মিল নেই। টুনুর মুখ ছিল লম্বাটে। এই ছেলেটির মুখ গোলাকার। টুনুর চুল ছিল কোঁকড়ানো। এর চুল

==

কোঁকড়ানো না। তাহলে ছেলের সঙ্গে মিলের ব্যাপারটা মাথায় আসছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে এই ছেলের সঙ্গে টুনুর মিল আছে ? মবিন উদ্দিন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন।

'তোমার দেশ কোথায় ?'

সে হাসল। প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা না হলে মানুষ যে ভঙ্গিতে হাসে সেই রকম হাসি।

'তোমার দেশ কোথায় বলতে চাচ্ছ না ?'

সে না সূচক মাথা নাড়ল।

'বলতে কী তোমার কোন অসুবিধা আছে ? অসুবিধা থাকলে বলার দরকার নেই।'

মবিন উদ্দিন চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরালেন। নতুন এক দুঃশ্চিন্তায় তিনি এখন আক্রান্ত হয়েছেন। অচেনা অজানা একটা ছেলেকে দুপুর রাতে বাসায় নিয়ে তুলছেন। সুরমা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে। খুব ভাল ভাবে নেবার কথা না। সুরমা অল্পতেই রেগে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্নেহ মমতা কমতে থাকে, রাগ বাড়তে থাকে। সুরমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে অন্যের তুলনায় বেশি ঘটেছে।

ফাঁকা রাস্তায় রিকশা খুব দ্রুত চলছে। বাতাসের কারণে শীতটা দশগুণ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস নাক মুখ আর কানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি থরথর করে কাঁপছেন, অথচ ছেলেটা চুপচাপই বসে আছে। গায়ের গরম শালের একটা অংশ কী ছেলেটাকে দিয়ে দেবেন ? মন ঠিক করতে করতে রিকশা বাসার সামনে এসে থামল।

ছেলেটাকে নিয়ে সরাসরি বাসায় ঢোকার সাহস তাঁর হল না। সুরমা কী জাতীয় হৈ চৈ শুরু করবে কে জানে। রেগে গেলে তার কথাবার্তারও কিছু ঠিক থাকে না।

ছেলেটাকে তিনি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। শুকনো গলায় বললেন, একটু দাঁড়াও আমি ডেকে নিয়ে যাব। তিনি ভয়ে ভয়ে দরজার কড়া নাড়লেন, দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করলেন, সুরমাকে ব্যাপারটা কীভাবে বলবেন। আসলে বড় ভুল হয়ে গেছে রিকশাতেই ভেবে টেবে ঠিক করে রাখা দরকার ছিল। রিকশায় সারাক্ষণ তিনি তাঁর ছেলের কথা ভেবেছেন।

তৃতীয়বার কড়া নাড়তেই তাঁর মেয়ে সুপ্তি দরজা খুলে দিল। সুপ্তির দিকে তাকিয়ে মবিন উদ্দিনের মন খারাপ হয়ে গেল।

==

আহারে কী সুন্দর তাঁর এই মেয়েটা। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর চোখ আল্লাহ্ তার এই মেয়েকে দিয়েছেন। কী ঘন কালো চোখ। দীর্ঘ পল্লব। অথচ সুপ্তির এই চোখ কোনো কাজে আসে না। সুপ্তি চোখে দেখে না।

মবিন উদ্দিন বললেন জেগে আছিস নাকি মা?

সুপ্তি বললো, না ঘুমোচ্ছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দরজা খুললাম।

সুপ্তির বয়স বারো। সে চাদরে শরীর ঢেকে মাথাটা এমন ভাবে বের করেছে যে তাকে অনেক বড় বড় লাগছে। মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না, মেয়েটা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে কেন, অবশ্যি জেগে থাকায় ভালই হয়েছে—শুরুতেই তাঁকে স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হয়নি। নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া সুপ্তি তার বাবাকে অনেকবার মা'র রাগ থেকে উদ্ধার করেছে। হয়তো এবারো করবে। মবিন উদ্দিন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মা জেগে আছে ?

'হুঁ। এত রাত হয়েছে আমরা ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।'

'তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে আছিস কেন ?'

সুপ্তি জবাব দেবার আগেই সুরমা চলে এলেন, কঠিন গলায় বললেন, রাত দুপুরে আসার দরকার ছিল কী ? থেকে গেলেই পারতে। খেয়ে এসেছ তো ?

'হুঁ।'

'দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এটা আবার কী রকম ঢং, ভেতরে আস।'

মবিন উদ্দিন ইতস্তত করে বললেন, আমার সঙ্গে একটা ছেলে আছে। ও চারটা ভাত খাবে।

সুরমা গলার স্বর তীক্ষ্ণ করে বললেন, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলে আছে মানে কী ? তুমি ছেলে পেয়েছ কোথায় ?

'রাস্তায় ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। সারাদিন কিছু খায়নি। ভাবলাম চারটা ভাত খাইয়ে দেই।'

'ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখানো লোকজন তুমি রাত একটার সময় বাসায় নিয়ে আসছ এর মানে কী ? হঠাৎ এত দরদ উথলে উঠল কেন ?'

'একটা ছেলে না খেয়ে আছে।'

'কত জনেইতো না খেয়ে আছে। তাদের কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতে হবে ?'

মবিন উদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। সুপ্তি বাবার সাহায্যে এগিয়ে এল। সে মা'র দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, বাবার ভাততো বাড়াই

আছে দিয়ে দাও খেয়ে চলে যাক। আচ্ছা থাক তোমাকে দিতে হবে না আমি এনে দিচ্ছি। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি পারবো। মা তুমি গিয়ে শুয়ে পড়।

সুরমা মুখ গম্ভীর করে চলে গেলেন। সুপ্তি বলল, তোমার ম্যাজিশিয়ান কোথায় বাবা?

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

'তোর মা'র ভয়ে আমিই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তোর মা হ্যাঁ বললে বাসায় নিয়ে আসব। এই ছিল পরিকল্পনা।'

'ডেকে নিয়ে এসো।'

মবিন উদ্দিন টুনুকে ডাকতে গেলেন। দরজা ধরে সুপ্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার বাবা রাত একটার সময় ম্যাজিশিয়ান ধরে নিয়ে এসেছেন এই ব্যাপারটা তার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। খাওয়ার পর ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক কী দু'একটা ম্যাজিক দেখাবেন? দেখাবেন হয়ত। গায়কদের গান গাইতে বললে তারা নানান অজুহাত তোলে, গলা ঠিক নেই, ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে, মুড নেই। ম্যাজিশিয়নদের ম্যাজিক দেখাতে বললে তারা সঙ্গে সঙ্গে দেখায়। না বললেও দেখায়। ইনিও নিশ্চয়ই দেখাবেন, দেখালেও সে দেখতে পাবে না। তাতে অসুবিধা নেই। কী ম্যাজিক হচ্ছে তা বলে দিলেই সে কল্পনা করতে পারবে। সুপ্তির ধারণা তার কল্পনার ম্যাজিক—আসল ম্যাজিকের চেয়ে ভালো।

ছেলেটি খেতে বসেছে। বসার ঘরের টেবিলে তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। ভাত তরকারী সবই ঠাণ্ডা। রাস্তার একটা ফালতু মানুষ খাবে তার জন্যে ভাত তরকারী গরম করার প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেটা ঠাণ্ডা খাবারই খাচ্ছে। বেশ আরাম করে খাচ্ছে। তার খাওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্ত। প্লেট থেকে একবার শুধু মুখ তুলে সুপ্তিকে দেখলো তার চোখে সামান্য হলেও বিস্ময় ঝিলিক দিল। মবিন উদ্দিন বললেন, এ হল সুপ্তি আমার মেয়ে। আমার একটাই মেয়ে। আর সুপ্তি এই ম্যাজিশিয়ানের নাম—টুনু।

ম্যাজিশিয়ান বললো, তুমি ভাল আছ? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে খেতে শুরু করলো।

সুপ্তির সারা শরীর কেঁপে উঠল। এই ম্যাজিশিয়ানের গলার স্বর অবিকল তার ভাইয়ার মত। মনে হচ্ছে অনেকদিন পর টুনু ভাইয়া ফিরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞেস করছে—তুমি ভাল আছ?

==

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের সামনের একটা চেয়ারে বসে আছেন। তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। কারণ ছেলেটিকে এখন আর কালো লাগছে না। মনে হচ্ছে তার গায়ের রং ফর্সা। শুধু ফর্সাই না বেশ ফর্সা। তিনি কী এতক্ষণ ভুল দেখেছিলেন? ম্যাজিশিয়ান ছেলে কোন রকম ম্যাজিক ট্যাজিক করছে না তো? ম্যাজিশিয়ানরা অনেক সময় চোখে ধান্ধা লাগিয়ে ফেলে সে রকম কিছু।

বাড়ির ভেতর থেকে সুরমা বিরক্ত গলায় ডাকলেন, সুপ্তি। এই সুপ্তি।

সুপ্তির ভেতরে যেতে ইচ্ছা করছে না। সে অপেক্ষা করছে ম্যাজিশিয়ান যদি আর কোন কথা বলে। কতো কথাইতো বলার আছে—"রান্না ভালো হয়েছে। কিংবা আজ খুব শীত পড়েছে।" অথচ সে আর কিছুই বলছে না। নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। সুরমা আবারো ডাকলেন—এই সুপ্তি! ডাকছি কানে যাচ্ছে না? সে নিতান্ত অনিচ্ছায় ভেতরে গেল। সুরমা বললেন, তুই ওখানে বসে আছিস কেন ?

সুপ্তি ফিস ফিস করে বলল, ম্যাজিশিয়ানের কথা শুনছি মা।

' কথা শোনার কী আছে ?'

সুপ্তি বলল, মা তুমি ওনার গলার স্বরটা একটু শুনে যাও। তুমি খুব চমকে যাবে। তোমার বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগবে।

'আজগুবি কথা বলিস কেন ? রাস্তার একটা ফালতু লোকের গলার স্বর শোনার কী আছে?'

'শোনার একটা জিনিস আছে মা। না শুনলে বুঝবে না। জানালার পাশে এসে একটু দাঁড়াও।'

সুরমা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল। সুরমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল— টুনু বসে আছে। অবিকল টুনু। এতে কোন রকম সন্দেহ নেই। সুরমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করতো এই ছেলের নাম কী ?

সুপ্তি ফিসফিস করে বলল, মা উনার নাম টুনু। বাবা তাই বলল।

সুরমা তাকিয়ে আছেন। তিনি তার চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না।

==

বারান্দার তোলা উনুনে ভাপা পিঠা বানাতে বসেছেন। এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই কারণে যে এ বাড়িতে গত ছয় বছরে ভাপা পিঠা হয়নি। এই পিঠা টুনুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শীতকাল এলেই টুনু রোজ ঘ্যান ঘ্যান করবে মা পিঠা কর—ভাপা পিঠা। খুব যখন ছোট ছিল তখন সে পিঠা হাতে নিয়ে বারান্দায় রোদে বসে থাকতো। গরম পিঠা—গা থেকে ভাপ উঠছে। টুনু একটু পরপর সেই পিঠা নাকের কাছে নিয়ে খেজুর গুড়ের গন্ধ নিচ্ছে এটা ছিল শীতকালের সাধারণ দৃশ্যের একটা।

সুপ্তি চুলার পাশে এসে বসল। আগুনের উপর হাত মেলতে মেলতে বলল, ভাপা পিঠা বানাচ্ছ তাই না-মা ? নারিকেল দাওনি কেন ?

সুরমার বুকে মোচড় দিয়ে উঠল। কী আশ্চর্য এই মেয়ে চোখে কিছু দেখছে না অথচ এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দেখছে। পিঠায় নারিকেল দেয়া হয়নি এটাও ধরতে পারছে।

'হঠাৎ করে ভাপা পিঠা কেন মা ?'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, তাতে অসুবিধা কী হয়েছে। ঘরে চালের গুড়া ছিল, খেজুর গুড় ছিল।

সুপ্তি ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, তুমি ভাপা পিঠা কর না তো, আজ হঠাৎ করলে।

'বাড়িতে একজন মেহমান এসেছে। পিঠা চিড়া করব না ?'

'মেহমান কে ? কার কথা বলছ ?'

'বাবলু।'

সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলল, বাবলু ? বাবলু কে ?

সুরমা একটু যেন লজ্জা পেলেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার তিনি নতুন নাম দিয়েছেন—বাবলু। তাকে টুনু নামে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। এম্নিতেই টুনুর সঙ্গে ছেলেটার খুব মিল। তার উপর যদি নামও হয় টুনু তাহলে অনেক সমস্যা।

==

আজ ফজরের সময় নামাজের অজু করতে উঠে দেখেন— টুনু সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে জবুথুবু হয়ে বসে আছে। সুরমা বললেন, "তুই এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস কেন ?" বলেই মনে হল—কী সর্বনাশ ! কাকে কী বলছেন ? এতো টুনু না। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা। ছিঃ ছিঃ কী হল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বাবা তুমি কিছু মনে করো না। আমি আসলে—

ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা বলল, আমি কিছু মনে করি নি। আমার সঙ্গে আপনার বড় ছেলের চেহারার মিল আছে এটা আমি বুঝতে পারছি। এই জন্যেই আপনি ভুলটা করেছেন।

'তোমার নাম কি আসলেই টুনু ?'

'জ্বি।'

'এই নামটা বদলে তোমাকে যদি অন্য কোন নামে ডাকি তুমি কি রাগ করবে?'

'জ্বি-না। আপনার যে নামে ডাকতে ইচ্ছা করে আপনি ডাকবেন।'

'বাবলু ডাকি ?'

'জ্বি অবশ্যই। বাবলু নামটাও সুন্দর।'

ফজরের ওয়াক্ত পার হয়ে যাচ্ছে—সুরমা কলঘরে অজু করতে গেলেন। বাবলু পিছনে পিছনে আসছে। কল টিপে দিতেই আসছে নিশ্চয়ই। টুনুও তাই করত—কোন ব্যাপারেই মা'র কোন সাহায্যে সে এগিয়ে আসবে না—শুধু কলঘরে মা'কে যেতে দেখলে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসবে। চাপকলে পানি তুলতে তার কোন আপত্তি নেই।

বাবলু চাপকলে পানি তুলছে—তিনি অজু করছেন। অজুর সময় আল্লাহ ছাড়া কারো কথাই মনে করতে নেই—তার একী হল শুধু টুনুর কথা মনে আসছে এবং চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মুখে অজুর পানি দেয়া বলে চোখের পানি আলাদা করা যাচ্ছে না।

মজার ব্যাপার হল, বাবলু নামটাও আসলে টুনুরই নাম। সবাই টুনুকে টুনু ডাকলেও তিনি ডাকতেন বাবলু। বাবু থেকে বাবলু। শেষ পর্যন্ত টুনু নামটাই টিকে গেল। তাঁর দেয়া নাম টিকল না।

সুপ্তি বলল, কথা বলছ না কেন মা ? বাবলু কে ?

'ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার নাম দিয়েছি বাবলু। টুনুর নামে তাকে ডাকতে ইচ্ছা করে না।'

==

'খুব বেশিতো আর তাঁকে ডাকাডাকি করতে হবে না। আমার ধারণা নাশতা খেয়ে উনি চলে যাবেন।'

'চলে গেলে চলে যাবে—যা-তো বাবলুকে নাশতা দিয়ে আয়। নিয়ে যেতে পারবি তো?'

'কী বল তুমি পারব না কেন?'

সুপ্তি নাশতার প্লেট এবং পানির গ্লাস নিয়ে যাচ্ছে। কী স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই না যাচ্ছে। বারান্দায় মাঝামাঝি জলচৌকি রাখা ছিল—তার কাছাকাছি গিয়ে সে জলচৌকিটা এড়িয়ে দরজার দিকে যাচ্ছে। দিক ভুল হচ্ছে না। তিনি নিজে কতবার দরজায় হোঁচট খেয়েছেন—এই মেয়ে কখনো খায়নি। তবে এই মফস্বল শহরে অন্ধদের জন্যে আলাদা স্কুল নেই—মেয়েকে তিনি সাধারণ স্কুলেই ভর্তি করেছেন। সে পড়াশোনা করছে। ভালই করছে। তার হাতের লেখা ভাল না—এলোমেলো কিন্তু তা পড়া যায়। স্কুলের আপারা কষ্ট করে হলেও সেই লেখা পড়েন। সে পাস করে নতুন ক্লাসে ওঠে। এইবার মেয়ে ক্লাস এইটে উঠেছে। হয়ত একদিন এস.এস.সি'ও পাস করবে। তারপর কী হবে? কে এই মেয়েকে বিয়ে করবে?

সুরমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি চোখে আঁচল চেপে বসে রইলেন।

ম্যাজিশিয়ান বসার ঘরের বিছানায় বসে আছে। সুপ্তি নাশতার পিরিচ নামাতে নামাতে বলল, আপনার ঘুম ভাল হয়েছে। ম্যাজিশিয়ান জবাব দিল না। তবে সুন্দর করে হাসল। যে হাসির অর্থ—"হ্যাঁ। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। খুকী তুমি ভাল আছ?'

'আপনি কি ভাপা পিঠা পছন্দ করেন? মা আপনার জন্যে ভাপা পিঠা বানিয়েছেন।'

'ভাপা পিঠা আমি খুব পছন্দ করি।'

'আপনি কি জানেন যে মা আপনাকে একটা নতুন নাম দিয়েছেন। সেই নামটা হল বাবলু। এখন আর আপনাকে আসল নামে ডাকা যাবে না। ভাল হয়েছে না?'

'হুঁ।'

'আপনাকে আসল নামে কেন ডাকা যাবে না সেটা জানেন?'

ম্যাজিশিয়ান জবাব দিল না। সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল, 'আমার একজন ভাই ছিল। তার নামও ছিল টুনু। আপনাকে টুনু বলে ডাকলে মা'র তার ছেলের কথা মনে পড়বে এবং খুব মন খারাপ হয়ে যাবে। এই জন্যে আপনাকে টুনু নামে ডাকা যাবে না।'

==

'ও আচ্ছা।'

'মা'র ধারণা আপনি দেখতেও অনেকটা আমার ভাইয়ার মতো।'

'ও।'

'তবে ভাইয়ার সঙ্গে আপনার সবচে বড় অমিল কী জানেন? সবচে বড় অমিল হচ্ছে ভাইয়া সারাক্ষণ কথা বলত। সে এক সেকেণ্ডও চুপ করে বসে থাকতে পারত না। এবং আমার মা'র ধারণা সে ঘুমের মধ্যেও কথা বলত। পিঠা খেতে কেমন হয়েছে?'

'খুব ভাল হয়েছে। তুমিও খাও।'

সুপ্তি খাটের পাশে চেয়ারে বসল। তার খুব মজা লাগছে। আজ স্কুলে ম্যাজিশিয়ানের গল্প করতে হবে। এত কাছ থেকে সে এর আগে কোন ম্যাজিশিয়ান দেখেনি। উনি কয়েকদিন বাসায় থেকে গেলে ভাল হত। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা সহজ ম্যাজিক সে শিখে রাখত। স্কুলের বন্ধুদের দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারত। তবে মেয়েরা ম্যাজিক শেখে কি-না কে জানে। সে কোনদিন কোন মেয়ে ম্যাজিশিয়ানকে দেখেনি।

'আচ্ছা আপনি কি আমার নাম জানেন?'

'জানি। তোমার নাম সুপ্তি।'

'আমি যে চোখে দেখতে পাই না সেটা কি জানেন?'

'হুঁ।'

'আপনার কি এই জন্যে খারাপ লাগছে?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলল না। সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল—এত সুন্দর একটা মেয়ে চোখে দেখতে পায় না, এই ভেবে আপনার খারাপ লাগছে না?'

'লাগছে।'

'আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। আমার নিজের কিন্তু খারাপ লাগে না। কোনদিনও তো চোখে দেখিনি কাজেই চোখে দেখতে না পাওয়ার কষ্টটা আমি জানি না। অন্যরা যখন আমাকে দেখে আহা উহু করে তখন আমার খুব খারাপ লাগে। আপনি দয়া করে আহা উহু করবেন না।'

'আচ্ছা করব না।'

'আপনি কি আজ চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ম্যাজিক তো দেখা হল না?'

'তুমি তো চোখে দেখতে পাও না। ম্যাজিক কীভাবে দেখবে?'

==

'আমি কল্পনা করে করে দেখি। আপনি কী দেখাচ্ছেন সেটা বললেই আমি বাকিটা কল্পনা করে নেবো। নাশতা খেতে খেতে একটা ম্যাজিক দেখান না। ভাপা পিঠাটা খেয়ে ফেলবেন কিছুক্ষণ পর কান দিয়ে কিংবা নাক দিয়ে সেই পিঠা বের করবেন। হি হি।

ম্যাজিশিয়ান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখটাও হাসি হাসি। সুপ্তি বলল, এই যে আমি হি হি করে হাসছি আপনি রাগ করছেন না তো ?

'না।'

'ক্লাসেও আমি সারাক্ষণ হি হি করে হাসি। এই জন্যে ক্লাসে আমার নাম হিহি রাণী। নামটা সুন্দর না ?'

'হ্যাঁ।'

'ক্লাসের মেয়েরা কী বলে জানেন ? তারা বলে আমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে হা হা করে হাসবে। এবং তার নাম হবে হাহা রাজা। হাহা রাজার বউ হিহি রাণী। বক বক করেই যাচ্ছি আপনি রাগ করছেন না তো ?'

'না।'

'এখন একটা ম্যাজিক দেখান। কারণ ক্লাসের মেয়েদের কাছে আমাকে গল্প করতে হবে। সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখান।'

ম্যাজিশিয়ান বলল, আচ্ছা দেখাচ্ছি। এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভাবো।

সুপ্তি ভাবল—তিন। কারণ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন। ভাইয়া বেঁচে থাকলে সে ভাবত চার। ভাইয়া যেহেতু বেঁচে নেই— কাজেই তিন।

'ভেবেছ ?'

'হুঁ।

'ম্যাজিশিয়ান বলল, চার বিয়োগ এক। হয়েছে ?'

'হুঁ হয়েছে। কিন্তু আপনি সরাসরি তিন না বলে চার বিয়োগ এক বললেন কেন ?'

'এম্নি।'

'আচ্ছা আমি মনে মনে একটা ফুলের কথা ভাবছি। বলুন তো কী ফুল ?'

ম্যাজিশিয়ান হাসল কিছু বলল না। সুপ্তি বলল, পারছেন না, তাই না ?

ম্যাজিশিয়ান তারও জবাব দিল না। সুপ্তির মন একটু খারাপ হল। তার ধারণা ম্যাজিশিয়ান বলতে পারবে। সে খুব সহজ ফুল ভেবেছিল—বেলীফুল। সুপ্তি বলল, আপনার ম্যাজিক কিন্তু খুব ভাল না। মোটামুটি।

===

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ তাই। মনে মনে একটা সংখ্যা ভাবা—সেই সংখ্যা বলে দেয়া অনেকেই পারে।'

'ও আচ্ছা।'

'একবার আমাদের স্কুলে একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছিল সে অনেক ভাল ভাল ম্যাজিক দেখিয়েছে। একটা ম্যাজিক ছিল খুবই অদ্ভুত। কেরোসিনের একটা চুলায় সে কড়াই দিল। কড়াই এ তেল ঢেলে দিল। তেল যখন ফুটে উঠল তখন সে একটা ডিম ভেঙ্গে কড়াই এ ছেড়ে দিল। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিল। এক সময় ঢাকনা তুলতেই ঢাকনার ভেতর দেখে একটা কবুতর বের হয়ে উড়ে চলে গেল। অদ্ভুত না ?'

'হ্যাঁ অদ্ভুত।'

'আপনি এ রকম ম্যাজিক দেখাতে পারেন না ?'

'না।'

'টুনু ভাইয়া একবার কোত্থেকে একটা ম্যাজিক শিখে এসেছিল। দড়ি কাটার ম্যাজিক। একটা দড়ি কাঁচি দিয়ে কাটা হয়। দড়িটা আপনা আপনি জোড়া লেগে যায়। আমাকে সে ম্যাজিকটা শিখিয়ে দিয়েছিল। আসলে মূল দড়িটা কাটা হয় না। আলাদা একটা ছোট্ট টুকরা কাটা হয়। সেই টুকরাটা লুকিয়ে ফেলা হয়। আপনি কি এই ম্যাজিকটা জানেন ?'

'না।'

'আচ্ছা আমি স্কুল থেকে এসে আপনাকে শিখিয়ে দেব। আপনি থাকবেন তো?'

'এখনো জানি না।'

'আমার মনে হয়—মা আপনাকে যেতে দেবে না।'

ম্যাজিশিয়ান বলল, আমারও তাই ধারণা।

'আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে আপনাকে দড়ির ম্যাজিক শিখিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

সুপ্তির ম্যাজিশিয়ানের সামনে থেকে উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। বেচারা ম্যাজিক না পারলেও তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। আজ স্কুলে না গেলে কেমন হয় ? এমন কোন ক্ষতি অবশ্যই হবে না তবে রেবতী আপা খুব ক্যাট ক্যাট করবে। সুপ্তি উঠে পড়ল। তাদের মর্নিং শিফ্‌ট। সকাল আটটায় ক্লাস শুরু

==

হয়ে যায়। একটা রিকশা ঠিক করা আছে তাকে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাবা সঙ্গে যান। আজ মনে হয় বাবা সঙ্গে যাবেন না।

মবিন উদ্দিন রান্নাঘরে স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। আগুনের পাশে বসে থাকতে তার ভাল লাগছে। মবিন উদ্দিন বললেন, ছেলেটাকে নাশতা দিয়েছ?

সুরমা বললেন, হ্যাঁ। চারটা পিঠা দিয়েছিলাম। চেটেপুটে খেয়েছে। মনে হয় ভাপা পিঠা খুব পছন্দ করে।

মবিন উদ্দিন স্ত্রীর দিকে তাকালেন কিছু বললেন না। এই বাড়ির আরো একজন ভাপা পিঠা খুব পছন্দ করতো। সেই স্মৃতি মনে করার চেয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করা ভাল। সুরমা বললেন, ছেলেটা কি আজ চলে যাবে? মবিন উদ্দিন বললেন, হ্যাঁ।

'কখন যাবে?'

'এখনই চলে যাক। রাতটা থাকার দরকার ছিল, থেকেছে।'

'এখনই যাবার দরকার কী? ভালমত একবেলা ভাতও তো খায়নি। রাতে ঠাণ্ডা কী সব খেয়েছে। পোলাওয়ের চাল এনো তো দুপুরে খিচুড়ি করব।'

'দুপুরে না করে রাতে কর। হাসের মাংস আর খিচুড়ি। শীতকালের হাঁস ভাল।'

সুরমা বললেন, ছেলেটা যদি চলে যেতে চায় তাকে বলে আজকের দিনটা রেখে দাও। কাল যাবে।

'বলে দেখি। থাকবে কি-না কে জানে।'

ম্যাজিশিয়ান একবার বলাতেই রাজি হয়ে গেল। মবিন উদ্দিন বললেন, তুমি কাল রাতে ঠাণ্ডা বাসি খাবার খেয়েছ এই জন্যেই সুপ্তির মা ভালমতো একবেলা খাওয়াতে চায়। একটা দিন থেকে যেতে তোমার অসুবিধা হবে না-তো?

ম্যাজিশিয়ান নরম গলায় বলল, জ্বি-না।

'আমি দোকানে যাব। তুমি যাবে না-কী আমার সঙ্গে?'

'জ্বি চলুন।'

'আগে একজন কর্মচারী ছিল, সেই দোকান খুলতো। তাকে বিদায় করে দিয়েছি। টাকা-পয়সা সরাতো। ঘরে পাঁচটা বাংলা ডিকশনারী ছিল—সংসদ অভিধান। একদিন গিয়ে দেখি একটাও নাই। আমি বললাম, ডিকশনারীগুলি কোথায়? সে হাবার মতো মুখ করে বলল, কিসের ডিকশনারী। বিদায় করে দিয়েছি। বিশ্বাসী কাউকে পাচ্ছি না—রাখাও হচ্ছে না। অবশ্যি ব্যবসার অবস্থাও

==================================

ভাল না। একজন কর্মচারী রাখার সামর্থ আমার নাই। সুপ্তির মা তোমাকে ভাল মন্দ খাওয়াতে চায়—চাইবেই। সামান্য চাওয়াটাও আমার জন্যে কষ্টদায়ক হয়। যাই হোক চল যাই। দোকানটা দেখবে।'

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানকে নিয়ে সারাদিন ঘুরলেন। পোলায়ের চাল কিনলেন, হাঁস কিনলেন। বাড়ি ফেরার পথে চায়ের দোকান দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন—ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, চা খাবে।

'জ্বি খাব।'

'চল চা খাই।'

তিনি খুব আরাম করে চা খেলেন। চা খেতে গিয়ে তাঁর একবারও মনে পড়ল না গত ছ' বছর তিনি চা খাননি। ছ' বছর পর চা খাচ্ছেন। এত বড় একটা ঘটনা—তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি মহা আনন্দে গল্প করে যাচ্ছেন।

'এই বছর কেমন শীত পড়েছে দেখলে ?'

'জ্বি।'

'যে বছর শীত বেশি পড়ে সেই বছর কলা খুব মিষ্টি হয়।'

'তাই না-কি ?'

'হুঁ। যে বছর গরম বেশি পড়ে সেই বছর আম হয় মিষ্টি। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন বড়ই অদ্ভুত।'

'জ্বি।'

'চা আরেক কাপ খাবে ?'

'জ্বি খাব।'

'মালাই চা খেয়ে দেখ। হাফ দুধ, হাফ চা। খুবই টেস্ট।'

দু'জন দু'কাপ মালাই চা নিলেন। আর ঠিক তখন মবিন উদ্দিন চমকে উঠলেন। তিনি চা খাচ্ছেন। এই তার দ্বিতীয় কাপ চা। মবিন উদ্দিন খুব লজ্জিত বোধ করছেন। যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করছেন। সাধারণ চা খেলেও একটা কথা ছিল—তিনি খাচ্ছেন মালাই চা। টুনুর অতি প্রিয় চা। এই দোকানেই তো টুনুকে নিয়ে তিনি কতবার এসেছেন।

সুরমা রান্না নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাঁস রান্না খুবই যন্ত্রণার ব্যাপার। পাখা ছাড়াতে হয়। বড় পাখাগুলি সহজে উঠে আসে কিন্তু ছোটগুলি আসতেই চায় না। আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছোট পাখা দূর করতে হয়। সুপ্তি যে তাকে সাহায্য করবে তা না। সে সন্ধ্যা থেকে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার সঙ্গে গল্প করছে। তিনি কিছু বলছেন না,

==

গল্প করছে করুক। বেচারী একা একা থাকে গল্প করার মানুষ নেই। টুনু যখন বেঁচে ছিল দুই ভাই-বোনের গল্পের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হতেন। দু'জনই কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না।

সুপ্তি রান্নাঘরে ঢুকল। আনন্দিত গলায় বলল, মা তোমার কোন সাহায্য লাগবে ?

সুরমা বললেন, না।

'পরে কিন্তু ডাকাডাকি করতে পারবে না।'

'তুই করছিস কী ? গল্প ?'

'উহুঁ। আমি উনাকে ম্যাজিক শেখাচ্ছি মা। দড়ি কাটার ম্যাজিক !'

'কী বলছিস তুই। ম্যাজিশিয়ান ছেলে তাকে তুই কী ম্যাজিক শিখাবি ?'

'উনি ম্যাজিক-টেজিক তেমন জানে না মা।'

'তাহলে যা। ম্যাজিক শিখিয়ে দে।'

সেই রাতে সুপ্তি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। যেন সে হাঁটতে হাঁটতে গভীর বনে ঢুকে গেছে। সেই বনের গাছগুলি অদ্ভুত। ডালের মাথা প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। গাছ ভর্তি ফুল। ছোট ছোট সাদা ফুল। আশ্চর্য কাণ্ড ফুলগুলি দেখতে বেলী ফুলের মতো। বেলী ফুলের তো এত বড় গাছ হয় না। বেলী ফুলগাছ লতানো ধরনের হয়। এত বড় গাছে বেলী ফুল ফুটেছে তার মানে কী! ফুলগুলির কী সুন্দর গন্ধ। স্বপ্নের মধ্যেই সুপ্তি গন্ধ পেল। এবং সে এতই অবাক হল যে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার ঘুম ভাঙ্গার পরেও স্বপ্নের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার সারা বিছানায় কেউ যেন বেলী ফুল বিছিয়ে রেখেছে। এটা কেমন স্বপ্ন যে স্বপ্ন ভাঙ্গার পরেও স্বপ্নের ছায়া থেকে যায়। এই স্বপ্নের সঙ্গে কি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কোন সম্পর্ক আছে ? না, তা কী-করে থাকবে। সুপ্তি ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন তার আর স্বপ্নের কথা মনে রইল না।

==

পনেরো দিন হল কালো যাদুকর মবিন উদ্দিনের বাড়িতে আছে। এক বুধবার এসেছিল, মাঝখানে এক বুধবার গিয়েছে, আজ আরেক বুধবার। এর মধ্যে তার নাম বদল হয়েছে। তাকে ডাকা হয় বাবলু নামে। সুরমা অবশ্যি মাঝে মাঝে ভুল করে টুনু ডেকে ফেলেন। সে বসার ঘরে থাকে। বসার ঘরে একটা সিঙ্গেল খাট আছে। খাটে ঘুমোয়। বাকি সময়টা খাটে বসেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম কয়েকদিন বসার ঘরেই তাকে খাবার দেয়া হত। এখন সুরমা ভাত খাবার সময় তাকে ভেতরে ডেকে নেন। ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন। সে বেশির ভাগ সময়ই হ্যাঁ না করে উত্তর দেয়। কথা বলার সময় চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। সুরমা অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে তেমন কিছু জানতে পারেননি। অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরেও সে এমন সব কথা বলে যার কোন অর্থ হয় না। যেমন সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশ কোথায়? সে ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে তার দিকে তাকিয়ে হাসল, উত্তর দিল না। তিনি আবার বললেন, তোমার দেশ কোথায়? গ্রামের বাড়ি?

সে চোখ না তুলেই বলল, নাম মনে নেই।

'নাম মনে নেই তার মানে কী? নাম ভুলে গেছ?

'হুঁ।'

'কোন জেলা সেটা মনে আছে?'

'জ্বি না।'

'নেত্রকোনা থেকে জায়গটা কত দূরে?'

'দূরে।'

সুরমা বললেন , দূরে তো বুঝলাম। কত দূরে?

'অনেক দূরে।'

'অনেক দূরেরও তো একটা হিসাব আছে। সেই হিসাবে বল কত মাইল দূরে?'

==

'জানি না।'

'জানি না কেমন কথা?'

বাবলু তার উত্তরে এমন ভাবে হাসছে যেন সুরমা অত্যন্ত বোকার মতো একটা প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই। সুরমার মনে নানান রকম সন্দেহ হয়, যেমন ছেলেটা পাগল নাতো? ভদ্র পাগল। হৈ চৈ করে না। চুপচাপ বসে থাকে। অনেক রকম পাগলই তো সংসারে থাকে এও এক ধরনের পাগল। পাগল হোক ছাগল হোক ছেলেটার উপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। মায়া পড়ার প্রধান কারণ হলো ছেলেটা দেখতে অবিকল তার মৃত ছেলের মতো। দ্বিতীয় কারণ, ছেলেটা অতি ভদ্র। আজকালকার ছেলেরা এত ভদ্র হয় না, বেয়াড়া ধরনের হয়। এ বেয়াড়া নয়। লাজুক এবং মুখচোরা। এরকম মুখচোরা লাজুক স্বভাবের ছেলে ম্যাজিক দেখায় কী করে সে এক রহস্য।

ম্যাজিকের ব্যাপারে সুরমার তেমন উৎসাহ নেই। ম্যাজিক হচ্ছে ছেলে ছোকরার বিষয়। ছেলেটার ম্যাজিক একবারই তিনি দেখেছেন। তাঁর কাছে এমন কিছু আহামরি মনে হয়নি। সে একটা কাগজ টেবিলের উপর রেখেছে। দেখতে দেখতে কাগজটায় আপনা আপনি আগুন ধরে গেল। চোখের সামনে পুড়ে ছাই। এটা এমন কোন ম্যাজিক না। কাগজে গোপনে কিছু দিয়ে রেখেছিল—এ্যাসিড ফ্যাসিড জাতীয় কিছু। ভাল ম্যাজিক, তবে এরচে ভাল ম্যাজিক তিনি ছোটবেলায় অনেক দেখেছেন। একজন যাদুকর শূন্য থেকে ডিম তৈরী করলেন। একটা ডিম থেকে দু'টা ডিম হল, তিনটা ডিম হল আবার মিলিয়ে গেল।

এই ছেলেটা ভাল ম্যাজিক দেখায় বলেই যে তাকে এখানে রাখা হয়েছে তা না। তার উপর মায়া পড়ে গেছে বলেই সে এখনো আছে। যেদিন মায়া কেটে যাবে তাকে চলে যেতে বলা হবে।

সংসারে একটা বাড়তি মানুষ পোষা সহজ ব্যাপার না। যে দিনকাল পড়েছে—নিজের আত্মীয় স্বজনদেরই কেউ জায়গা দেয় না আর এ-হল বাইরের অজানা অচেনা একজন মানুষ। এই যুগে অচেনা একজনকে বিশ্বাস করাও ঠিক না।

রাতে ঘুমোতে যাবার সময় সুরমার প্রায়ই মনে হয় ছেলেটা জ্বীন ভূত না-তো! মানুষের সংসারে জ্বীন এসে বাস করে এরকম গল্পতো প্রায়ই শোনা যায়। একটা গল্প আছে—মাদ্রাসার হোস্টেলে থেকে একটা জ্বীনের ছেলে পড়ে। পড়াশোনায় খুব ভাল। মাদ্রাসার সুপার একরাতে ছেলেটার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি কী মনে করে যেন ছেলেটার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি

=======================================

দিলেন। দেখলেন—ছেলেটা বিছানায় শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। হঠাৎ সে হাতের বইটা রেখে বইয়ের শেলফের দিকে হাত বাড়াল। বইয়ের শেলফটা ঘরের অন্য প্রান্তে, অনেকটা দূরে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন ছেলেটার হাত লম্বা হচ্ছে—লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসার সুপার এই দৃশ্য দেখে ভয়ে বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর থেকে ছেলেটাকে আর দেখা গেল না।

হতেও তো পারে টুনু নামের এই ছেলেটা আসলে একটা জ্বীন। মানুষের বেশ ধরে তাদের সঙ্গে আছে। সুরমা এক রাতে ছেলেটার সম্পর্কে তাঁর এই ভীতির কথা মবিন উদ্দিনকে বলেছিলেন। মবিন উদ্দিন বিরক্ত গলায় বলেছেন, তোমার কি ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেল? সুরমা আমতা আমতা করে বললেন, কথার কথা বলছি। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপার ঘটে। মবিন উদ্দিন বলেছেন, জগতে কোন রহস্যময় ব্যাপার ঘটে না। একটি দরিদ্র ছেলে ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখায়। থাকার জায়গা নেই, কয়েক দিন এখানে আছে। তোমার যদি পছন্দ না হয়—বলে দাও চলে যাবে। তাও তো বলছ না। রোজ রান্না করে খাওয়াচ্ছ। বেশ আদর করেই তো খাওয়াচ্ছ।

'ছেলেটা ওর নিজের সম্পর্কে কিছুই তো বলছে না। দেশ কোথায় এইটাই এখন বলেনি।'

'কোনো কারণে হয়ত বলতে চায় না।'

'বলতে চাইবে না কেন? এটা সন্দেহজনক না? তুমি একদিন ভাল মতো জিজ্ঞেস কর না কেন?'

'করব। জিজ্ঞেস করব। এখন ঘুমাও তো। ঘ্যান ঘ্যান করবে না।'

'আমি ঘ্যান ঘ্যান করছি?'

'হ্যাঁ করছ। তুমি হচ্ছ এমন একজন মহিলা যার চিন্তার সঙ্গে কর্মের কোন মিল নেই। তুমি কাজ কর উত্তরে, চিন্তা কর দক্ষিণে।'

'তার মানে কী?'

'মানে বুঝাতে পারব না। সব কিছুর মানে বুঝতে পারলে তো কাজই হয়েছিল। রাত হয়েছে এখন ঘুমাও।'

মবিন উদ্দিন পাশ ফিরে শুলেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ দুপুরেই তিনি সুরমাকে দেখেছেন ম্যাজিশিয়ন ছেলেটির সঙ্গে অদিখ্যেতা করছে। তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। ছেলেটা বলল, সে সজনে ডাঁটা খাবে না। সুরমা অবাক হয়ে বলল, এ কী সজনে ডাঁটা খাবে না কেন? খুবই পুষ্টির জিনিস।

==

খাও বললাম। না খেলে আমি খুবই রাগ করব। আমার রাগ কী জিনিস তুমি জান না।

অচেনা অজানা একটা ছেলে, সে সজনে ডাঁটা না খেলে না খাবে। এত কেন সাধাসাধি?

খাবার পর টক দৈ-এর বাটি বের হল। মবিন উদ্দিন জানেন টক দৈ ছেলেটার জন্যে আনা হয়েছে। তিনি বা সুপ্তি কেউই টক দৈ খায় না। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা অত্যন্ত পছন্দ করে খায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে তার ছেলে টুনুও টক দৈ পছন্দ করে খেত। রোজ খাওয়া শেষ করে বলত, মা টক দৈ আছে?

হ্যাঁ ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার মধ্যে কিছু রহস্যময় ব্যাপার আছে। সুযোগ-সুবিধা মতো তিনি দু একটা কথা হয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তবে ছেলেটা এমন কোন অপরাধ করেনি যে উকিল হয়ে প্রশ্ন করে তাকে নাজেহাল করতে হবে।

বাবার নাম কি?
মায়ের নাম কি?
দেশের বাড়ি কোথায়?
মামার বাড়ি কোথায়?
কোন জেলা, কোন গ্রাম?
পড়াশোনা কী?

যত ফালতু ব্যাপার। একটা দরিদ্র ছেলে বিপদে পড়ে কয়েক দিন আছে। যথাসময়ে চলে যাবে। নিজে থেকে যদি না যায় তিনিই চলে যেতে বলবেন। খুব ভদ্রভাবে বলবেন। যাতে বেচারা মনে কষ্ট না পায়। তিনি নিজে দরিদ্র মানুষ তাঁর পক্ষে যত দিন সম্ভব হয়েছে তিনি সাহায্য করেছেন। এখন আর পারছেন না।

মবিন উদ্দিন খুব ভাল করে জানেন সুরমা বা সুপ্তি কেউই ম্যাজিশিয়ান ছেলেটিকে চলে যেতে বলতে পারবে না। তারা ছেলেটাকে অসম্ভব পছন্দ করে। তার কাছে মনে হয় এটাও ঠিক না। কোন কিছুর বাড়াবাড়িই ভাল না। কাউকে পছন্দ করা ভাল, কিন্তু সেই পছন্দ বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হওয়াটা ভাল না। তাঁর ধারণা সুরমা ও সুরমার কন্যা স্বাভাবিকভাবে কিছু করতে পারে না। সবকিছুকেই তারা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যায়। ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করেন তবে সেই পছন্দের মধ্যে কিন্তু আছে। বেশ বড় ধরনের কিন্তু। তাঁর ধারণা ছেলেটা মনের কথা বুঝতে পারে। এরকম মনে করার পেছনে কারণ আছে।

গত পরশু দুপুরে তিনি খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছেন। শীতকালের দুপুরে লেপের ভেতর ঢুকলে ঘুম আসবেই। তাঁরও ঘুম আসছে, চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন, হঠাৎ মনে হল জর্দা দিয়ে একটা পান খেতে পারলে ভাল হত। ঘরে পানের চল নেই। পান খেতে হলে কাউকে দোকানে পাঠাতে হয়। বাবলু আছে, তাকে বললেই হয়, বলতে ইচ্ছা করল না। সুরমা নানান ভেজাল করবে। হেন তেন শতেক প্রশ্নে মাথা বরিয়ে দেবে।

পান আনাচ্ছ কেন?

জর্দা দিয়ে পান আবার কবে ধরলে?

একটা কোন নেশা ছাড়া থাকতে পার না না?

সিগারেট, পান, বাকি রইল কী? মদটা ধরে ফেল, তাহলে কেউ আর বলতে পারবে না যে একটা নেশা বাকি আছে।

শত প্রশ্নের জবাব দেবার চেয়ে শুয়ে থাকা ভাল। সন্ধ্যাবেলায় যখন বের হবেন তখন দোকান থেকে একটা পান কিনে নিলেই হবে। মবিন উদ্দিন ঘুমোবার আয়োজন করলেন, কিন্তু ঘুম এল না, মাথার মধ্যে পান ঘুরতে লাগল।

কয়েক বছর আগে ঢাকা শহরে স্টেডিয়ামে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা পান খেয়েছিলেন, সেই পানের স্বাদ এখন মুখে লেগে রয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, বইয়ের চালান আনতে এবার যখন ঢাকা যাবেন গোটা দশেক পান নিয়ে আসবেন। দোকানে রেখে দেবেন যে ক'দিন খাওয়া যায় খাবেন।

মনের এই অবস্থায় সুন্তি ঢুকল। তাঁকে হতভম্ব করে দিয়ে বলল, বাবা এই নাও তোমার জর্দা পান।

তিনি বললেন, জর্দা পান মানে? পান কী জন্যে?

'খাবার জন্যে আবার কী জন্যে।'

'কে এনেছে?'

'ম্যাজিশিয়ান ভাইয়া এনেছে।'

'সে শুধু শুধু পান আনবে কেন? তাকে কি আমি পান আনতে বলেছি?'

'বলেছ নিশ্চয়ই ভুলে গেছ। ইস্ বাবা তুমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা যে বলতে পার। আশ্চর্য। কথা বাড়িও না পান নাও আমি হোম ওয়ার্ক করছি।'

মবিন উদ্দিন পান নিলেন তবে তাঁর মনে বিরাট এক কিন্তু ঢুকে গেল। ব্যাপারটা কী? ছেলেটা যতবড় ম্যাজিশিয়ানই হোক পিসি সরকার তো না। পিসি সরকারও মনের কথা বলতে পারতেন না। এ বলছে কীভাবে? সাধু-সন্ন্যাসী পীর ফকিরদের এই সব ক্ষমতা থাকে। এই ছেলে সাধু-সন্ন্যাসীও না পীর-ফকিরও না। এত শখের জর্দা দেয়া পান তাঁর কাছে ঘাসের মতো লাগতে লাগল।

==

আরেক দিনের কথা তিনি বিরস মুখে দোকানে বসে আছেন।

বিক্রি-বাটা কিছুই নেই। কাস্টমার তো দূরের কথা মাছিও উড়ছে না। বিকেলের দিকে একজন কাস্টমার এসে একটা জ্যামিতি বাক্স নাড়াচাড়া করল। দাম জিজ্ঞেস করল কিনল না। মবিন উদ্দিন তার দোকানে বই ছাড়াও খাতা, পেন্সিল, জ্যামিতি বাক্স এই সব রাখেন। যাতে অফ সিজনে পুরোপুরি বসে থাকতে না হয়। কোনই লাভ নেই। যখন বই বিক্রি হয় না তখন অন্য কিছুও বিক্রি হয় না। মবিন উদ্দিনের ধারণা হল আজ বোধ হয় মঙ্গলবার। মঙ্গলবারটা তাঁর জন্যে খারাপ। আজ কী বার তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য মনে করতে পারলেন না। একবার মনে হচ্ছে সোমবার আরেকবার মনে হচ্ছে মঙ্গলবার। ঘরে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। তারিখ জানা থাকলে বারটা বের করা যেত। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তারিখটাও তাঁর মনে নেই। নিজের উপর যখন খুবই রাগ লাগছে তখন বাবলু বলল, স্যার আজ বুধবার।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আজ কী বার তা কি আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি?

ছেলেটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, জ্বি না।

'তাহলে শুধু শুধু বললে কেন আজ বুধবার? অকারণে কথা বলবে না। অকারণে কথা আমি নিজে বলি না। অন্য কেউ বললেও আমার ভাল লাগে না। এটা মনে রাখবে। অধিক কথা বলা মানে অকারণে আয়ুক্ষয়।'

'জ্বি আচ্ছা মনে রাখব।'

ছেলেটার এই সব রহস্য তাঁর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছা করে ডেকে বলেন, ঠিক করে বল তো তোমার ব্যাপারটা কী। ঝেড়ে কাশ। তুমি কি মনের কথা বুঝতে পার? পারলে বল হ্যাঁ, না পারলে বল, না। নো হাংকি পাংকি। আমি যেমন অধিক কথা বলা পছন্দ করি না, তেমনি হাংকি পাংকিও পছন্দ করি না।

ছেলেটা যদি স্বীকার করে সে মনের কথা বলতে পারে তাহলে তিনি তাকে দুটা কথা শুনিয়ে দেবেন। কঠিন ভাবে বলবেন, মনের কথা বলার এই বিদ্যা শিখলে কোথায়? এটা তো ভাল বিদ্যা না। এটা খারাপ বিদ্যা। যে বিদ্যায় মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয় সেই বিদ্যা খারাপ বিদ্যা। সেই বিদ্যার চর্চা করাও পাপ। কথাগুলি দেরি না করে বলে ফেলা দরকার। মবিন উদ্দিন রোজই একবার ভাবেন আজ বলবেন, শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না। তারপর এমন এক ঘটনা ঘটল যে মবিন উদ্দিন মনস্থির করলেন, ব্যাপারটা আজই ফয়সালা করবেন।

==

ঘটনাটা এরকম, মাঝরাত। তিনি ঘুমুচ্ছেন। প্রচণ্ড শীত পরেছে, তিনি লেপের নীচে ঢুকে আছেন। শীতের জন্যেই তার ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। জানালা ভাল মতো বন্ধ হয়নি হুহু করে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর মনে হল বসার ঘরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। জিনিস পত্র নাড়াচাড়া করছে। চোর নাতো? কৃষ্ণপক্ষের শীতের রাতগুলি চোরদের জন্যে খুবই আনন্দের। গায়ে তেল মেখে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে চুরি করতে যায়। খুট খাট শব্দ যতই হোক গৃহস্থ জাগবে না। শীতের রাতের সুখের ঘুম ঘুমাবে। ঘর কবরের মতো অন্ধকার। ট্রান্সফরমার বার্স্ট করেছে বলে সাতদিন ধরে ইলেকট্রিসিটি নেই। ট্রান্সফরমার ঠিক করারও কিছু হচ্ছে না। শহরের একটা অংশ অন্ধকারে পরে আছে। অদ্ভুত দেশ। মেঝেতে যে হারিকেন জ্বালানো ছিল সেটি কী কারণে যেন নিভে গেছে। মবিন উদ্দিন দেয়াশলাইয়ের খোঁজে বালিশের নীচে হাত দিলেন। যা ভেবেছিলেন, দেয়াশলাই নেই। সুরমার দেয়াশলাই ভীতি আছে। বালিশের নীচে বা তোষকের নীচে দেয়াশলাই দেখলেই সে সরাবে। তার ধারণা প্রায়ই আপনা-আপনি বোম ফাটার মতো দেয়াশলাইয়ের বাক্স ফেটে উঠে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়। নেহায়েত তাঁর সাবধানতার জন্যে এ বাড়িতে কিছু হচ্ছে না। মবিন উদ্দিন সাবধানে খাট থেকে নামলেন। অন্ধকারে দরজা খুলে বসার ঘরে এলেন। চোর বাড়িতে থাকলেও দরজা খোলার শব্দে এতক্ষণে পালিয়ে যাবার কথা। তারপরেও ঘরে হাঁটাহাটির শব্দ হচ্ছে। বিস্মিত মবিন উদ্দিন বললেন, কে?

ছেলেটা বলল, জ্বি আমি।

'এত রাতে জেগে আছ?'

'জ্বি।'

'কী করছ?'

'বই পড়ছি।'

'বই পড়ছি মানে। অন্ধকারে বই পড়ছ কীভাবে?'

ছেলেটা কোন জবাব দিল না। মবিন উদ্দিন বললেন, কী বই পড়ছ?

'সুপ্তির ইতিহাস বইটা একটু দেখছিলাম।'

'তুমি কী অন্ধকারে দেখতে পাও?'

'জ্বি।'

'কীভাবে দেখ? ম্যাজিকের সাহায্যে?

==

বাবলু জবাব দিল না। মবিন উদ্দিন বললেন, আমি গায়ে কি পরেছি তুমি বলতে পারবে?

'আপনি হলুদ রং এর একটা গেঞ্জি পরে আছেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ইতিহাস বই পড়, আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'ভাল কথা তুমি কি বলতে পারবে আমার দেয়াশলাইটা কোথায়? বলতে পারলে বল। হারিকেনটা জ্বালিয়ে রাখি। শীতের রাতে চোরের উপদ্রব হয়।'

'দেয়াশলাইটা আপনার বালিশের নীচেই আছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

মবিন উদ্দিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন, একী যন্ত্রণা। খাল কেটে কুমীর আনেননি তো? মনে হয় এনেছেন। কুমীরের চেয়েও ভয়াবহ কিছু নিয়ে এসেছেন। অক্টোপাস নিয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি সুরমার সঙ্গে আলাপ করতে চান না। জটিল ব্যাপার থেকে মেয়েদের দূরে রাখাই নিয়ম। সমস্যার শুরুতে মেয়েদের জানানো মানে সমস্যা আরও জট পাকিয়ে ফেলা। নিয়ম হচ্ছে সমস্যা শেষ হলে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে মেয়েদের জানানো।

সারা রাত মবিন উদ্দিনের ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে ফজরের আজান শুনলেন। পাখ পাখালির ডাক শুনলেন। দেখলেন—সুরমা বিছানা থেকে নামছে। অজু করতে যাচ্ছে, তাঁরও ওঠা উচিত। এম্নি নামাজ কাজা করা এক জিনিস আর আজান শুনে কাজা করা ভিন্ন জিনিস। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। প্রবল ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুমের মধ্যেই বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখলেন। যাদুকর এবং তিনি হাঁটছেন। বনের ভেতরের পায়েচলা পথে হাঁটছেন। ঘন বন, তবে খুব পরিচ্ছন্ন। বনের নীচে ঝোপ ঝাড় নেই। কার্পেটের মতো দুর্বা ঘাস। বনটা খানিকটা রহস্যময়, কারণ কোন শব্দ নেই। চারদিক সুনসান নীরবতা। বাতাসে গাছের পাতা নাড়ছে না। পাখি ডাকছে না, কিচ্ছু না। তারা দু'জন যে হাঁটছেন সেই হাঁটাও নিঃশব্দ হাঁটা।

মবিন উদ্দিন প্রথম প্রশ্ন করলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ছেলেটা বলল, আমরা কোথাও যাচ্ছি না তো। আপনি আমাকে কিছু জরুরি প্রশ্ন করবেন বলেছিলেন, সেই জন্যে নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে এসেছি। আপনার কি মনে হচ্ছে না জায়গাটা খুব নিরিবিলি ?

'তুমি কে?'

==

'আমি একটা গাছ?'

'কী বললে! গাছ?'

'জ্বি।'

'তুমি মানুষ না?'

'জ্বি না।'

'তুমি গাছ?

'জ্বি আমি গাছ।'

'কী গাছ? আম না কাঁঠাল? নাকি সাধারণ জঙ্গলা গাছ?'

'আমি একটা গাছ সেটাই বড় কথা, কী গাছ সেটা বড় কথা না। কেউ যদি বলে সে মানুষ তাহলে তো সব বলা হয়ে যায়। মানুষের বেলায় কি আলাদা করে পরিচয় দেবার দরকার পড়ে? তাহলে গাছের বেলায় দরকার হবে কেন?'

'একটা গাছ মানুষ সেজে আমার বাড়িতে আছে এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার না?'

'না খুব আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু না। অনেক গাছই মানুষ সেজে থাকে। কেউ তাদের ধরতে পারে না। অনেকে আবার জানেও না যে তারা মানুষ না তারা গাছ।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কি আর কিছু জানতে চান?'

'তুমি মানুষের মনের কথা বলতে পার?'

'তা পারি। গাছদের অনেক ক্ষমতা।'

'গাছদের অনেক ক্ষমতা?'

'জ্বি। যাদের ক্ষমতা বেশি থাকে তারাই কখনো অন্যকে সেই ক্ষমতা দেখায় না। ক্ষমতা যত অল্প হয় সেই ক্ষমতা প্রদর্শনের ইচ্ছাও তত বেশি হয়।'

'তোমার আর কী ক্ষমতা আছে?'

'আপনাকে বলতে চাচ্ছি না।'

'বলতে চাচ্ছ না কেন?'

'আমি আপনার মাথা এলোমেলো করে দিতে চাচ্ছি না। এম্নিতেই আপনার মাথা যথেষ্ট এলোমেলো হয়ে আছে।'

স্বপ্নের এই পর্যায়ে হঠাৎ ঝড় শুরু হল। প্রবল ঝড়। বাতাসের ঝাপটা আসছে আর প্রকাণ্ড সব গাছ নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশ যদিও দেখা যাচ্ছে না, মবিন উদ্দিন বুঝতে পারছেন আকাশ ঘন-কালো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এতক্ষণ যে

==

বন নিঃশব্দ ছিল এখন তা শব্দময়। তাড়স্বরে পাখি ডাকছে। মট মট শব্দে গাছের ডাল ভাঙ্গছে। ভয়াবহ অবস্থা। ঝড়ের সঙ্গে শুরু হল বর্ষণ। ঘন বর্ষণ। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। তিনি ছুটতে শুরু করেছেন। ছুটে কোথায় যাবেন? যেদিকেই যান সেদিকেই বন। তিনি একী মহা বিপদে পড়লেন? এর মধ্যে মেয়েকণ্ঠে হাসির শব্দ শোনা গেল। এই ভয়াবহ দুর্যোগে কে হাসে। কার এত আনন্দ?

মবিন উদ্দিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি শুনলেন সুপ্তি হাসছে। হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। সুপ্তি ঘরে ঢুকল, এখন তার মুখে হাসি।

'বাবা কী মজার একটা কাণ্ড যে হচ্ছে, ম্যাজিশিয়ান ভাইয়া উঠোনে বসে দাঁত মাজছিল। হঠাৎ কোথেকে একটা কাক এসে তার মাথায় গু করে দিয়েছে। হি হি হি।'

সুপ্তির হাসি আর থামেই না। মবিন উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি, নিজের মেয়েটাকেও অচেনা লাগছে। এই বিচিত্র স্বপ্ন দেখার মানে কী?

স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। মানুষ তার এক জীবনে কত বিচিত্র স্বপ্নই না দেখে। ছোটবেলায় তিনি একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন—শেয়ালের মত সুঁচালো মুখের কী একটা প্রাণী খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলা শেষ করে সেই প্রাণীটা হাই তুলতে লাগল। তখন এই প্রাণীটার মা এসে বলল, এই তুই কিছু না খেয়েই ঘুমুতে শুরু করেছিস। কিছু খেয়ে নে। ওম্নি প্রাণীটা তার উরুতে কামড় দিয়ে একদলা গোশত তুলে নিল। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি জেগে উঠলেন। উরুতে কামরের দাগ-টাগ কিছু ছিল না। কিন্তু অনেক দিন ব্যথা ছিল।

ছোটবেলার স্বপ্নটা যেমন অর্থহীন ছিল গত রাতের স্বপ্নও তেমন অর্থহীন। স্বপ্ন নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই।

ছেলেটা অন্ধকারে দেখতে পারে এই খটকা অবশ্যি থেকেই যায়। তা সেটাও কোন বড় ব্যাপার না ম্যাজিকের কোন কৌশল হবে। ভাল ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিকের অনেক কৌশল জানে। সেও জানে। শুধু শুধু এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই।

====================================

আজ ছুটির দিন—দোকান খুলতে হবে না। মবিন উদ্দিন বিশ্রাম করতে পারেন। শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। শরীরের চেয়ে মন বেশি খারাপ ব্যবসাপাতি হচ্ছে না। দোকান বিক্রি করে অন্য কিছু করবেন? এই বয়সে অন্য কিছু করার কথা চিন্তা করাও কষ্টের। ছেলেটা বেঁচে থাকলে হত না। এই বয়সটা নৌকায় চড়ে চারদিকের শোভা দেখার বয়স। হাল ধরার বয়স না।

মবিন উদ্দিন নাস্তা করলেন। কিছুক্ষণ রোদে বসে রইলেন। আজ ঠাণ্ডা অন্যদিনের চেয়ে কম। তারপরেও রোদে বসে থাকতে ভাল লাগছে।

সুপ্তি বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। মবিন উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বলবি ?

সুপ্তি বলল, না। আচ্ছা বাবা তোমার কি মন খারাপ ?

'উহুঁ।'

'তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ।'

'আমার মন খারাপ নারে মা, আমার মন ভাল। বেশ ভাল। তুই কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবি ?'

সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলল, অবশ্যই পারব।

সুপ্তি জানে তার বাবা চা খান না। এক সময় খুব খেতেন। বিশেষ একটা ঘটনার পর চা ছেড়ে দিলেন। সেই বিশেষ ঘটনাও সে জানে। আজ হঠাৎ বাবার চা খেতে চাইবার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না। তার বাবা কি বদলে যাচ্ছেন? শুধু তার বাবা না— তারা সবাই কি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে না ?

মবিন উদ্দিন বললেন, বাবলু কোথায়?

'মা বাজারে পাঠিয়েছেন।'

'তোর মা'কে বলিস আমি দুপুরে খাব না।'

'কোন খাবে না?'

রাহেলা আজ দুপুরে তার ওখানে খেতে বলেছে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে কি কথাবার্তাও নাকি আছে। তুই কি যাবি আমার সঙ্গে?'

সুপ্তি বলল, না।

'না কেন? চল যাই।'

'ফুপুর বাড়িতে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি এক কাজ কর— বাবা ম্যাজিক ভাইয়াকে নিয়ে যাও। সে ভালমন্দ কিছু খেয়ে আসুক। দিনের পর দিন বেচারা আজে বাজে খাবার খাচ্ছে।'

==

মবিন উদ্দিন কিছু বললেন না। সংসারের চিন্তাটা আবার তাঁর মাথায় ঢুকে গেল। পোস্টাপিসের পাস বই এ তাঁর আর অল্প কিছু টাকা অবশিষ্ট আছে। এই টাকা শেষ হলে সব শেষ। তিনি কীভাবে সামলাবেন।

'বাবা তোমার মন কি খারাপ?'

'না মন খারাপ না।'

'আমি প্রায়ই দেখি তুমি খুব মন খারাপ করে থাক। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তা কর। ব্যাপারটা কী?'

'কিছু না রে মা।'

'আমি যে ফুপুর বাসায় যেতে চাচ্ছি না এই জন্যে মন খারাপ করছ? বাবা শোন ঐ বাড়িতে যেতে আমার ভাল লাগে না। তারা এত বড়লোক—আমরা গরীব। ফুপু ঠিকমত আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন না। তুমি বলতে গেলে প্রতি সপ্তাহে ঐ বাড়িতে যাও। ফুপু কখনো আসেন না। আমার মনে হয় তোমারও এত ঘন ঘন যাওয়া উচিত না।'

'ভাই বোনের বাড়িতে যাবে না! কী বলিস তুই। মনে কর তোর খুব টাকাওয়ালা বাড়িতে বিয়ে হল। টুনু হয়ে গেল গরীব। সেই গরীব টুনু কি তোর বাড়িতে যাবে না!'

সুপ্তি বলল, অবশ্যই যাবে। এবং তুমিও যাবে। আর শোন বাবা তুমি আমার কথায় কিছু মনে করো না। আমারতো আসলে বুদ্ধি বেশি না। আমি খুবই বাচ্চা মেয়ে।

মবিন উদ্দিন হাসলেন। তাঁর ধারণা তাঁর এই মেয়ের খুবই বুদ্ধি। শান্ত বুদ্ধি। মেয়েদের এত বুদ্ধি থাকাটা অবশ্যি ঠিক না। বেশি বুদ্ধির মেয়েদের সংসারে শান্তি থাকে না। বোকা টাইপ মেয়েগুলি সুখে ঘর সংসার করে। কে জানে তাঁর এই মেয়ের কপালে সুখের ঘর আছে কি-না। থাকার অবশ্যি কোন কারণ নেই। কার দায় পড়েছে অন্ধ মেয়ে বিয়ে করার ?

রাহেলাদের বাড়িতে মবিন উদ্দিন দুপুরের আগেই পৌছলেন। দোতলা পাকা দালান। সামনে বাগান আছে। বাড়ির পেছনে বাঁধানো পুকুর। গত বছর পোনা ছেড়েছিল—এখন সেই পোনা বড় হয়েছে। আজ জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে। সবাই ভিড় করে আছে পুকুর পাড়ে। মবিন উদ্দিনও গেলেন। রাহেলা ভাইকে দেখে এগিয়ে এল। রাহেলার মুখ ভর্তি পান। সুখী সুখী চেহারা।

'ভাইজান আপনার সঙ্গে খুবই জরুরি কিছু কথা আছে।'

==

'বল কী কথা।'

'ঐ দিকে চলেন যাই। এইসব কথা কারোর না শোনাই ভাল।'

মবিন উদ্দিন শংকিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কি কথা আছে যে কেউ শুনলে অসুবিধা হবে। তিনি নিতান্তই নিরামিষ মানুষ। কারো কোন সমস্যার মধ্যে নেই।

'কী কথা বলতো?'

'তোমাদের বাড়িতে না-কি একটা ছেলে থাকে?'

'ও আচ্ছা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ তার কথাই বলছি। পথে ম্যাজিক দেখাতো, তুমি নাকি তাকে বাড়িতে নিয়ে তুলেছো। সেই ছেলে সবার সঙ্গে খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মবিন উদ্দিন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। রাহেলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ভাবীর যে তালের ঠিক নাই সেটাতো আমরা সবাই জানি। আপনি কেন এরকম হবেন। আপনার কেন মাথা আউলা হবে? চেনা নাই পরিচয় নাই, বাইরের একটা ছেলে পথেঘাটে ম্যাজিক দেখায় সে কি-না ভেতর বাড়িতে ঘুরঘুর করে।

'ছেলেটা ভাল।'

'কী করে বুঝলেন ছেলেটা ভাল? ভাল ফ্যামিলির ছেলে পথেঘাটে যাদু দেখায়? আপনার বাড়িতে বড় একটা মেয়ে আছে। আছে না?'

'বড় কোথায়। সুপ্তি বাচ্চা মেয়ে।'

'ক্লাস এইটে পড়ে মেয়ে বাচ্চা? শুনেন ভাইজান আমার বিয়ে হয়েছিল ক্লাস এইটে পড়ার সময়।'

'ও।'

'ভাইজান ঘটনা শুনে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। ছিঃ ছিঃ কী কান্ড! পথের একটা ছেলে ভেতর বাড়িতে ঘুরঘুর করছে। একটা বদনাম যদি রটে যায় উপায় আছে ? আপনি আজই ছেলেকে বিদায় করবেন।'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখিটেখি না ভাইজান। আপনি বাড়িতে যাবেন, ছেলেকে বলবেন, পথ দেখ। আর লক্ষ্য রাখবেন সে যেন আর ফিরে না আসে। ছেলে যে সারাদিন ভেতরের বাড়িতে বসে থাকে— সে করে কী? ভাবীকে ম্যাজিক শেখায়?'

'সারাদিন ভেতরের বাড়িতে থাকে না। আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসে।'

'তাহলে তো ঘটনা ঘটছে। আপনার দোকানের পয়সা-কড়ি নিশ্চয়ই মেরে সাফ করছে। আপনি যে রকম মানুষ কিছুই বুঝতে পারছেন না। আপনার চোখের সামনে দিয়ে হাতি গেলেওতো আপনি দেখেন না।'

==

'তুই যতটা অস্থির হচ্ছিস তত অস্থির হবার মতো কিছু না। বাইরের একটা ছেলেওতো ঘরের ছেলের মতো হতে পারে। পারে না?'

'ভাইজান শুনেন তিন দিন ঘরে থেকে যদি কেউ ঘরের মানুষ হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সমস্যা আছে বিরাট সমস্যা। আপনি আজই ঐ ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। আপনি নিজে বলতে না পারেন— আমি বকুলের বাবাকে বলে দিচ্ছি সে সন্ধ্যার পর যাবে ঐ হারামজাদাকে কানে ধরে বের করে দেবে।

'তার দরকার নেই।'

'আপনি নিজে যদি তাকে বের না করেন, আমি অবশ্যই বকুলের বাবাকে পাঠাব।'

মবিন উদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রাহেলা মনে হচ্ছে এই সামান্য ব্যাপারে নিয়ে ভাল ঝামেলা করবে। বকুলের বাবা আব্দুল মজিদ মানুষটা ছোটখাট এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী হলেও কঠিন লোক। তিনি নিজে তাকে খুবই অপছন্দ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় রাহেলার যদি এই মানুষটার সঙ্গে বিয়ে না হত তার জীবনটা অনেক সুখের হত। বস্তা বস্তা টাকা থাকলে কিছু হয় না। টাকার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কিন্তু বস্তা বস্তা টাকার দরকার নেই।

'ভাইজান!'

'বল।'

'বকুলের বাবা তোমাকে কী যেন বলবে, যাবার আগে শুনে যেও।'

'আচ্ছা।'

মবিন উদ্দিনের অস্বস্তি লাগছে। আব্দুল মজিদের সঙ্গে কথা বলে তিনি কখনোই স্বস্তিবোধ করেন না। যদিও আব্দুল মজিদের ভদ্রতা এবং বিনয় তুলনাহীন। সেই বিনয় এবং ভদ্রতার পেছনে কিছু একটা থাকে যা অসহনীয়।

আব্দুল মজিদ মবিন উদ্দিনকে দেখেই পা ছুঁয়ে সালাম করল। হাসি মুখে বলল, ভাইজান ভাল আছেন?

মবিন উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, ভাল।

'আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাইজান। স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া দরকার। জোয়ান বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙ্গলে সামাল দেয়া যায়—শেষ বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙ্গলে আর সামাল দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক। তুমি নাকি কী বলবে আমাকে?'

আব্দুল মজিদ বিনয়ে প্রায় ছোট হয়ে গিয়ে বলল, মেয়ের বিয়েতো ভাইজান

==

একটু অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেছি। তিন চারটা বিল আটকা। আপনার টাকাটা যদি পেতাম খুবই ভাল হত।'

মবিন উদ্দিন মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বছর চারেক আগে দোকান কেনার সময় তিনি আব্দুল মজিদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। এই ধার শোধ করতে পারেননি।

'আপনাকে বলতেও লজ্জা লাগছে। কী যে অসুবিধায় পড়েছি। এতদিন ধরে কনট্রাকটারী করছি এমন অসুবিধায় পড়িনি। আগামী বুধবার নাগাদ কি টাকাটা পাওয়া যাবে ভাইজান?'

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। আব্দুল মজিদ বলল, আপাতত আপনি টাকাটা দেন পরে প্রয়োজন বোধে আবার নিবেন। আমার কোন উপায় নেই ভাইজান টাকার ব্যবস্থা আপনাকে করাই লাগবে।

মবিন উদ্দিন নিজের অজান্তেই বললেন, আচ্ছা।

আব্দুল মজিদ বলল, রাহেলার কাছে শুনেছি কী একটা ছেলে নাকি আপনার বাড়িতে ঢুকে পরেছে। দরকার মনে করলে আমাকে বলবেন—শুয়োরের বাচ্চাকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব। ফাজলামীর জায়গা পায় না।

'শুধু শুধু তাকে মেরে তক্তা বানাবে কেন? এটা কি ধরণের কথা।'

'ঝামেলা করলে একটু বলবেন। না মেরেও অনেক কিছু করা যায়।'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব।'

'ঠিক আছে ভাইজান। অসুবিধা হলে আমাকে খবর দিবেন। আর ভাইজান বুধবারে টাকাটার জন্য আমি নিজেই আসব। সন্ধ্যার দিকে আসব। গরজটা আমার। আপনার কাছে চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। না চেয়েও উপায় নেই।'

মবিন উদ্দিন খুবই মন খারাপ করে ফিরলেন। খালি হাতে ফিরলেন না, আব্দুল মজিদ পুকুর থেকে মারা দু'টা সিলভার কার্প মাছ সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

===================================

মাগরিবের নামাজ শেষ করে মবিন উদ্দিন শোবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। আজো ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। ঘর অন্ধকার মেঝেতে হারিকেন জ্বলছে। সুরমা বাটিতে করে ভাজা মুড়ি নিয়ে ঢুকলেন। মবিন উদ্দিন বললেন, মুড়ি খাব না।

সুরমা বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? তখন থেকে চুপচাপ বসে আছ।

মবিন উদ্দিন জবাব দিলেন না। সুরমা বললেন, বোনের বাড়িতে কী হল বল। বকুলের বিয়ে নিয়ে নতুন কোন কথা হয়েছে?

'না।'

'ওরা খুব খুশি না?'

'হুঁ।'

'এ রকম মুখ শুকনা করে বসে আছ কেন? ব্যাপারটা কী বলতো?'

'কোন ব্যাপার না। এম্নি ভাল লাগছে না।'

'রাহেলা কি তোমাকে কিছু বলেছে!'

'না সে আর কী বলবে।'

'মনে হচ্ছে তুমি কোন কিছু নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তা করছ? কী নিয়ে দুঃশ্চিন্তা।'

'কোন কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না। এম্নি শরীরটা ভাল লাগছে না। আচ্ছা সুরমা শোন—ম্যাজিশিয়ান ছেলেটাকে এখন চলে যেতে বললে কেমন হয়?'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ওকে চলে যেতে বলবে কেন?

'অনেক দিনতো হয়ে গেল। এখন সে তার ঘর বাড়িতে যাক।'

'তার কি ঘর বাড়ি আছে না-কি যে সে যাবে। যাবেটা কোথায়?'

'আগে যেখানে ছিল সেখানে যাবে। সারা জীবনতো আর আমরা একটা মানুষকে পালবো না। তাই না।'

===================================

'তুমিতো খুবই আজগুবি কথা বলছ। একটা অসহায় ছেলে—যাবার জায়গা নেই। সে তোমার কয়টা ভাত খাচ্ছে? তুমি কি তাকে পোলাও কোর্মা খাওয়াচ্ছো?

'না তা না।'

'তা না তাহলে কী? ওকে নিয়ে তোমার সমস্যাটা কী?'

'বাইরের একটা ছেলে ঘরে পড়ে আছে। লোকজন নানান কথা বলাবলি কার।'

'সেই লোকজনটা কে? তোমার বোন?'

'হ্যাঁ সে বলছিল।'

'কী বলছিল ওকে বিদেয় করে দিতে?'

'হুঁ।'

'আমার সংসারে কে থাকবে না থাকবে সেটা আমি দেখব। তার সংসার নিয়েতো আমি চিন্তা করি না। সে কেন আমার সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি টুনুর ঘরটা ওকে খুলে দিয়েছি। এখন থেকে এই ঘরেই সে থাকবে।'

মবিন উদ্দিন স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। টুনুর মৃত্যুর পর তার ঘর তালাবন্ধ ছিল। সুরমা বলেছিলেন, তিনি কোনদিন এই ঘরের তালা খুলবেন না। এই ঘরের তালা সারাজীবন বন্ধ থাকবে। সেই তালা খোলা হয়েছে।

মবিন উদ্দিন বললেন, ছেলেটাকে তুমি খুব পছন্দ কর?

'হ্যাঁ করি তাতে অসুবিধা কী! একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে পছন্দ করতে পারে না?'

'আগে যে বলতে ছেলেটা মানুষ না। জ্বীন এখন আর তা বল না।'

'কী ধরনের কথা তোমার, শুধু শুধু একটা ছেলেকে আমি জ্বীন বলব কেন? আমার কি মাথাটা খারাপ হয়েছে।'

'না, তোমার মাথা ঠিকই আছে।'

সুরমা বললেন, আমার সঙ্গে এসো একটা জিনিস দেখে যাও।

'কী দেখব?'

'সুপ্তি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার ঘর কী সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখে যাও। আমি ঘরে ঢুকে অবাকই হয়েছি। মন লাগিয়ে কাজ করলে সুপ্তি ঘরের কাজ ভাল করে। এসো দেখে যাও।'

===================================

'এখন না। পরে দেখব।'

সুপ্তির হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মনে খুব আনন্দ। এত আনন্দ ভাল না। যত আনন্দ তত দুঃখ। এই জন্যেই যাদের জীবনে আনন্দের ভাগ কম তাদের জীবনে দুঃখও কম। এটাও বোধহয় ঠিক না, তাঁর জীবনে আনন্দ নেই বললেই হয় অথচ দুঃখতো তাই বলে কম তাতো না। বুধবারের মধ্যে এক লক্ষ টাকা জোগাড় করতে হবে। কোথায় পাবেন এত টাকা?

সুপ্তি হাসছে। মবিন উদ্দিন মেয়ের হাসি শুনছেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটাকে বিদায় করে দিলে তার এই মেয়েটা সবচে' কষ্ট পাবে। তাঁর এই মেয়েটা দুঃখী। তার দুঃখের কোন সীমা নেই। অন্য কেউ তা জানুক বা না জানুক, তিনি জানেন। তার এই মেয়েটা যখন গভীর আনন্দ নিয়ে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে তখন তাঁর ভাল লাগে। আহা মেয়েটা আনন্দে থাকুক। আনন্দ মেয়েটার জন্যে খুব দরকার।

সুপ্তির সঙ্গে টুনুর ভাবটা সবচে বেশি। সে বিকট একটা চিৎকার দেবে, "ম্যাজিক ভাইয়া, ও ম্যাজিক ভাইয়া।"

ম্যাজিক ভাইয়া ঘর থেকে হাসি মুখে বের হবে। সুপ্তি তাকে দেখে হড়বড় করে বলবে, "আজ স্কুলে কী হয়েছে শুনে যান। শুনলে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছে। জিয়োগ্রাফি মিসের কথা আপনাকে বলেছি না খুব রাগী। আমাদের হেড মিসট্রেস আপা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পান। এই মিস আজকে চেয়ার ভেঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেছেন। আমাদের হাসি আসছে কিন্তু আমরা হাসতে পারছি না। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। তখন কী হল জানেন? কেউ হাসল না। আমাদের ফার্স্ট গার্ল সাদেকা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ফেলল, সেই হাসি আর থামেই না। জিয়োগ্রাফি আপা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি চিন্তাও করতে পারেননি সাদেকা হাসতে পারে। এই হল সুপ্তির রোজকার রুটিন। প্রতিদিনই তাদের স্কুলে মজার মজার কিছু ঘটছে। স্কুল থেকে ফিরেই সেই সব মজার ঘটনা ম্যাজিক ভাইয়াকে না শোনানো পর্যন্ত সুপ্তির শান্তি নেই।

আগে সুপ্তিকে পড়াতেন মবিন উদ্দিন। সুপ্তি গালে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে থাকতো—মবিন উদ্দিন তার বইগুলি পড়তেন। একবার দুবার তিনবার। সুপ্তি তৃতীয়বারের সময় বলতো, বাবা আর লাগবে না হয়েছে। এখন তুমি আমার হাতের লেখা দেখ। হাতের লেখাগুলি কি এখনো বড় বড় ? এরচে ছোটতো করতে পারি না। এরচে ছোট করলে কেউ পড়তে পারবে না।

==

এখন সুপ্তির পড়ার ধরন বদলেছে। মবিন উদ্দিনের স্থান নিয়েছে ম্যাজিশিয়ান। সে পড়ে, সুপ্তি গালে হাত দিয়ে শোনে। এবং পড়ার মাঝখানে বলে, থুক্কু। আবার পড়েন। আমি আসলে আপনার পড়া শুনছিলাম না। অন্য কিছু ভাবছিলাম।

'কী ভাবছিলে ?'

'তা বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন ?'

'বলা যাবে না কারণ আমি যদি বলি তাহলে আপনার একটু মন খারাপ হবে। আমি আপনার মন খারাপ করতে চাই না। শুধু আপনার কেন কারোরই মন খারাপ করতে চাই না।'

'তুমি বল—আমার মন খারাপ হবে না।'

'ম্যাজিক ভাইয়া, আমি যদিও খুব হাসি-খুশি থাকি তারপরেও আমার কিন্তু সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে। ভয়ংকর মন খারাপ থাকে। প্রতি রাতে ঘুমুবার আগে আমি কাঁদি।'

'ও আচ্ছা।'

'কেন কাঁদি জানেন ? কাঁদি কারণ আমার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। হাজার চেষ্টা করেও পারি না। আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে—হিন্দু মেয়ে, নাম অর্চনা সবাই বলে সে না-কি পরীর মত সুন্দর। আরেকটা মেয়ে আছে নাম কামরুন নেসা সবাই আড়ালে কামরু নেসাকে ডাকে মিকি মাউস। তার চেহারা না-কি ইঁদুরের মত। আমি ওদের দু'জনের মুখের উপর হাত বুলিয়েছি দু'জনকে আমার একই রকম লেগেছে।'

'সব মানুষতো এক রকমই।'

'মোটেই এক রকম না, কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর। সেই সুন্দর অসুন্দরটাই বুঝতে পারি না। আমার খুব কষ্ট হয়। কেউ কালো, কেউ ফর্সা। কালো ফর্সা কী? আচ্ছা থাক অনেক বক বক করলাম, এখন পড়া শুরু করুন। পড়া শুরু করার আগে বলুন—আপনাকে যে সব কথা বললাম, সে সব কথা কখনো বাবা বা মা'কে বলবেন না।'

'বলব না।'

'এইভাবে বললে হবে না। বিদ্যা ছুঁয়ে বলুন। জ্যামিতি বইটা ছুঁয়ে বলুন।'

'জ্যামিতি বই ছুঁয়ে শপথ করলে কী হবে ?'

'আপনার আর জ্যামিতি শেখা হবে না। ত্রিভুজের দুটি বাহু আর তাদের অন্তঃস্থ কোণ সমান হলে যে ত্রিভুজ দু'টা সমান হয় এই সাধারণ ব্যাপারটাও আপনি জানবেন না।'

'আচ্ছা যাও শপথ করলাম।'

পড়াশোনার শেষে টুনুকে ম্যাজিক দেখাতে হয়। রোজ একটা না একটা দেখাতে হবেই। ম্যাজিকগুলি খুব সুন্দর আবার খুবই সহজ। তারচেয়েও বড় কথা চোখে না দেখেও সুপ্তি ম্যাজিকগুলি বুঝতে পারে। ম্যাজিক দেখানোর জন্যে ম্যাজিশিয়ানের কিছুই লাগে না। সে সুপ্তিকে বলবে, দেখি তোমার বল পয়েন্ট কলমটা হাতে শক্ত করে ধরে থাক। সুপ্তি ধরে থাকল।

'এবার কলমটার দিকে তাকিয়ে থাক। দৃষ্টি পুরোপুরি কলমটার উপর। অন্য কোন দিকে তাকাবে না। আড় চোখেও না।'

'আমার তাকানো না তাকানোয় তো কিছু যাচ্ছে আসছে না। আমি তো কিছু দেখছি না।'

'তবু তাকিয়ে থাক।'

সুপ্তি তাকিয়ে থাকল।

'চোখের পাতা ফেলবে না।'

'পাতা ফেললে কী হবে?'

'ম্যাজিক হবে না।'

সুপ্তি তাকিয়ে থাকে। পাতা না ফেলার জন্যে চোখে পানি জমতে শুরু করে এবং তখন মনে হয় হাতের ভেতরেই কলমটা যেন বদলে যাচ্ছে। কোন অদ্ভুত উপায়ে যেন জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। জিনিসটা যেন হাতের ভেতর ছটফট করছে। ভয় পেয়ে কলমটা ফেলে দিয়ে সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলে, এটা আপনি কীভাবে করেন?

সে হাসে। সুপ্তি বলে, না হাসলে হবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই আপনি শুধু হাসেন। হাসি বন্ধ। আপনাকে বলতে হবে।

'এই ধরনের ম্যাজিক খুবই সহজ। ইচ্ছা করলে তুমিও পারবে।'

'তাহলে আমাকে শিখিয়ে দিন। আমি স্কুলে বন্ধুদের দেখাব। ওদের আক্কেল গুড়ুম করে দেব।'

সে গম্ভীর হয়ে বলে, আচ্ছা শেখাব।

'কবে শেখাবেন বলুন। তাড়াতাড়ি শেখাতে হবে। নয়তো একদিন দেখবেন ম্যাজিক শেখার আগেই আমি ফট করে মরে গেছি।'

'মরে যাবে কেন?'

==

'ও আচ্ছা আপনাকে বলা হয়নি—আমি বেশিদিন বাঁচব না।'

'সেটা কী করে জান ?'

'খুব ভাল করে জানি। কোন একদিন আমি ফট করে মরে যাব। কীভাবে মরবো তাও জানি।'

'কীভাবে মরবে ?'

'পুকুরে ডুবে। আমাদের নানার বাড়িতে বিরাট একটা পুকুর আছে। পুকুরটার চারদিকে নারকেল গাছ। খুব গভীর পুকুর। কোন একদিন নানার বাড়িতে যাব। সারাদিন মনের আনন্দে পুকুরের চারদিকে হাঁটব। তারপর...

'তারপর কী ?'

'তারপর ঝপাং।'

'ঝপাং মানে ?'

'আমি লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ে যাব। আর উঠব না। কারণ আমি সাঁতার জানি না।'

'এইটা তুমি ঠিক করে রেখেছ ?'

'হুঁ। অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। শুধু একজনকে বলেছিলাম, ভাইয়াকে। আর এখন বললাম আপনাকে, আপনি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তাই না ?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলল না। সুপ্তি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভাইয়াও বিশ্বাস করেনি। ভাইয়ার সঙ্গে আসলেই আপনার অনেক মিল। বিশ্বাস না করলে নাই। এইসব আলাপ করতে ভাল লাগছে না। অন্য কোনো আলাপ করুন। আচ্ছা বলুন তো পৃথিবীর সবচে' বড় ম্যাজিশিয়ান কে ছিলেন? আপনার কি ধারণা পিসি সরকার? হয়নি। মারলীন। ইংল্যান্ডের রাজা কিং আর্থারের সভাতে উনি ছিলেন একজন সভাসদ। তাঁর মতো বড় ম্যাজিশিয়ান এই পৃথিবীতে হয় নি কোনোদিন হবেও না।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

'আমাদের জিয়োগ্রাফি ম্যাডাম। উনি যেমন রাগী তেমনই জ্ঞানী।'

'আমার ধারণা এই পৃথিবীর সবচে বড় ম্যাজিশিয়ান হল গাছ।'

'গাছ?'

'হ্যাঁ গাছের মতো ম্যাজিক আর কেউ জানে না। এদের ম্যাজিক তুলনাহীন।'

'বাবা যে বলে আপনার মাথা খারাপ, ঠিকই বলে। আপনার মাথা পুরোপুরি মাসকান্দা।'

==

'মাসকান্দা মানে কী খুব বেশি মাথা খারাপ?'

'হুঁ। মাসকান্দা মানে হল চিকিৎসার অতীত মাথা খারাপ। দিনকান্দা মানে—চিকিৎসা করলে সারবে। মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক আপনাকে আমি কিন্তু খুব পছন্দ করি। এটা কি আপনি জানেন?'

'জানি।'

'কতটা পছন্দ করি তা-কি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ তাও জানি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করেন। করেন না?'

'হ্যাঁ করি।'

'কতটুক পছন্দ করেন?'

'আমার পছন্দের ধরনটা আবার অন্য রকম, আমি সব মানুষকেই একই রকম পছন্দ করি।'

'তার মানে কি আমাকে যতটা পছন্দ করেন রাস্তার একটা ফকিরণীকেও ততটা পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এ-রকম কেন?'

'আমি এরকম কারণ আমি ঠিক মানুষ না।'

'মানুষ না তাহলে আপনি কী?'

'আমি আসলে গাছ। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা আসলে মানুষ না গাছ। তাদের জীবন-যাপন প্রণালী মানুষের মতো তবে...

'তবে কী?'

'থাক তুমি বুঝবে না।'

'আমি ঠিকই বুঝেছি আপনি একজন ফোর্টি নাইন প্লাস ফোর্টি নাইন। ডাবল ফোর্টি নাইন।'

সুপ্তি খিলখিল করে হাসছে। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটিও হাসছে। সুপ্তি হাসি থামিয়ে বলল,

'আপনি ভাইয়ার মতই ডাবল ফোর্টি নাইন।'

'সেও কি বলত সে গাছ?'

'না তা বলত না। তবে সারাক্ষণ হাসলে লোকে পাগল বলবে না? একবার কি হয়েছে শুনুন, বাবা রাগ করে ঠাশ করে তার গালে চড় মেরেছে। সে চড় খেয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। কেন বলুন তো?'

==

'বলতে পারছি না।'

'কারণ—চড়ের শব্দ হল—'ঠাশ'। কিন্তু বাবার চড়ের শব্দটা না-কি ছিল ধরাম। দরজা বন্ধ করার মতো শব্দ। এই জন্যে হাসছিল।'

'তোমার ভাইয়া তো খুব মজার মানুষ ছিলেন।'

'মোটেই মজার মানুষ ছিল না। ভাইয়া ছিল—ডাবল ফোর্টি নাইন। মাসকান্দা টাইপ।'

ম্যাজিশিয়ান সুপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে। সুপ্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আচ্ছা বাদ দিনতো এই নিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। অন্যকিছু নিয়ে কথা বলুন। আচ্ছা আমি একটা ছড়া বলছি মন দিয়ে ছড়াটা শুনুন—

"গুণধর ছেলে সে মায়ের আদর
খেলতো না, হাসতো না, নামটি সাগর
তনুতার কৃশকায় মুখটি করুণ।
ছেলেটি কী খেত—আপনি বলুন।"

'কী বলতে পারবেন, সাগর নামের ছেলেটা কী খেত ?'

'না বলতে পারছি না।'

'ছড়ার প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরটা আলাদা করুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন সাগরের প্রিয় খাদ্য কী ? হি হি হি।'

সুপ্তি হাসছে। ম্যাজিশিয়ান তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ বুধবার। মবিন উদ্দিন তাঁর দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন। দুই লাখ দশ হাজার টাকা পেয়েছেন। তাড়াহুড়া করে বিক্রি করতে হল। খোঁজ-খবর করে বিক্রি করতে পারলে হয়ত আরো বেশি পেতেন। পুরো ব্যাপারটা করতে হয়েছে গোপনে। সুরমা সুপ্তি কেউ জানে না। ইচ্ছা করেই জানাননি। তারা খুব মন খারাপ করতো। বিক্রি না করে উপায়ও ছিল না। বুধবার সন্ধ্যায় আব্দুল মজিদ চলে আসবে। ভদ্র এবং বিনয়ী গলায় বলবে, ভাইজান টাকাটা। আপনাকেতো বলেছিলাম খুব দরকার।

মবিন উদ্দিন জানেন টাকার তার কোন দরকার নেই। মেয়ে বিয়ের অজুহাত তৈরী হয়েছে। অনেক দিন পর চাপ দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে। আব্দুল মজিদ কখনোই কোন সুযোগ ছাড়ে না। এই সুযোগ কেন ছাড়বে? তাঁর উচিত ছিল টাকাটা দিয়ে দেয়া। তিনি পারেননি। এখনো পারছেন না। কিন্তু এখন আর গত্যন্তর ছিল না।

=======================================

কেউ দোকান বিক্রির খবর জানে না। কিন্তু মবিন উদ্দিনের ধারণা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা জানে। খুব ভাল করেই জানে। সকালে তিনি দলিল রেজিস্ট্রির জন্যে যাচ্ছেন সে বলল, কোথায় যান?

তিনি বললেন, দোকানে।

এটা মিথ্যা কথা। তিনি যাচ্ছিলেন—সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে। ছেলেটা কেমন করে জানি হাসল। তারপর বলল, আমি সঙ্গে আসব?

তিনি বললেন, না।

সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হত। এতগুলি টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা। আজকাল এক দুইশ টাকার জন্যে মানুষ খুন হয়। তার সঙ্গে থাকবে দুই লাখ দশ হাজার টাকা।

তিনি কাউকে সঙ্গে নিলেন না। একাই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে গেলেন। দোকান বিক্রি করলেন। অনেক সখ করে দোকান দিয়েছিলেন। সুখে দুঃখে এই দোকান তাঁর সঙ্গী ছিল। শো রুমের পেছনে ছোট্ট ঘরটায় চৌকি পাতা। চৌকিতে বিছানা। মাঝে মাঝে তিনি রাতে দোকানে এসে ঘুমাতেন। সুরমার সঙ্গে রাগারাগি করে দোকানে চলে যেতেন। অনেক রাতে টুনু টর্চ লাইট নিয়ে আসত। গম্ভীর গলায় বলতো, বাবা ঘরে চল। তিনি কথা বাড়াতেন না। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতেন। বেচারা এতদূর একা একা এসেছে। তাঁর রাগ করে ঘুমুতে আসার ঘরটা আর থাকল না। সুরমাকে ব্যাপারটা কীভাবে বলবেন বুঝতে পারছেন না। পরামর্শ করার একজন কেউ থাকলে ভাল হত।

ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত। টুনু বেঁচে থাকলে তাঁর কোন সমস্যাই হত না। তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে ছেলেকে বলতেন—নেরে ব্যাটা, বিরাট সমস্যায় পড়েছি। দোকান বিক্রি করে দিয়েছি। এই নে এখানে দু'লাখ দশ হাজার টাকা আছে। তোর ফুপা সন্ধ্যাবেলা আসবে তাকে এক লাখ টাকা দিবি। বাকি টাকায় কী করবি না করবি তুই দেখ। সংসার চালাতে হবে। কীভাবে চালাবি তুই জানিস। আমি অবসর নিলাম। পাঁচটা টাকা দে চায়ের স্টল থেকে চা খেয়ে আসি। চায়ের স্টলের মজাই অন্যরকম।

সকাল এগারোটার মধ্যেই দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। তিনি পাঞ্জাবির পকেটে টাকা নিয়ে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করছে শহরের পথে পথে হাঁটতে। এতগুলি টাকা পকেটে নিয়ে পথে পথে হাঁটা সম্ভব না। তিনি ঠিক করলেন তার দোকানে যাবেন। তার পুরানো ঘরে দুপুরটা শুয়ে থাকবেন।

শেষবারের মত শুয়ে থাকা। বিকেলে বাড়ি ফিরবেন। আব্দুল মজিদকে টাকাটা দিয়ে দেবার পর সুরমাকে সব খুলে বলবেন। বিউটি বুকের নতুন মালিক

==

শেষবারের মতো তাঁকে কিছুক্ষণ তাঁর পুরানো জায়গায় শুয়ে থাকতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। বাড়ি ফেরার পথে নিধু সাহার কাপড়ের দোকান থেকে সুপ্তির জন্যে একটা শাড়ি কিনে ফেলবেন। মেয়েটার শাড়ির শখ। জীবনের প্রথম শাড়ি পরা মেয়েদের জন্যে বিরাট একটা ঘটনা। সেই ঘটনাটা আজ রাতেই ঘটুক। দুঃখের দিনেও তো দু'একটা আনন্দময় ঘটনা ঘটতে পারে।

সুপ্তিদের স্কুল দু'টার সময় ছুটি হয়। মবিন উদ্দিন স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েকে নিয়ে রিকশায় করে বাড়িতে ফেরেন। দিন দশেক হল, রিকশায় করে ফিরছেন না—হেঁটে ফিরছেন। সুপ্তিকে বলেছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একসারসাইজ হচ্ছে হাঁটা। যারা দিনে এক ঘণ্টা হাঁটে তাদের কোন অসুখ বিসুখ হয় না। ফকিরণীদের দেখ—খেতে পায় না বললেই হয়। এদের স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ না। অসুখ বিসুখও কম হয়। ঠিক বলছি না ?

সুপ্তি হাসি চাপতে চাপতে বলল, ঠিক বলছ।

'কাজেই আমি ঠিক করেছি তোকে হেঁটে স্কুলে আনব। আবার আমরা ফেরত যাব হাঁটতে হাঁটতে। ঠিক আছে রে মা ?'

'ঠিক আছে।'

'হাঁটতে কষ্ট হবে না-তো ?'

'মোটেই কষ্ট হবে না।'

সুপ্তির হাঁটতে কষ্টতো হয়ই না বরং ভাল লাগে। রাস্তাঘাট চেনা হয়ে যায়। স্কুল গেট থেকে কিছুদূর গেলেই চামড়ার গন্ধ পাওয়া যায়। তার মানে বড় রাস্তা এসে পড়েছে। বড় রাস্তায় ঢোকার মুখেই স্যুটকেসের দোকান। চামড়ার গন্ধ আসে স্যুটকেসের দোকান থেকে। দোকানটাকে বাঁদিকে রেখে তারা এগুতে থাকে। যখন ভক করে নাকে মুখে তীব্র পচা গন্ধ ঢোকে তখন রাস্তা ক্রস করে ঐ পারে যেতে হয়। তীব্র গন্ধটা আসে ডাস্টবিন থেকে। রাস্তা পার হবার পর অল্প একটু যাবার পর গলিতে ঢুকতে হয়। গলিটা চেনাও সহজ। গলির মুখেই চায়ের দোকান। চা বানানোর টুং টাং শব্দ আসে—চা পাতার মিষ্টি গন্ধ আসে।

মবিন উদ্দিন বলেন, হাত ধরে হাঁট মা। হাত না ধরে হাঁটছিস কীভাবে।

সুপ্তি বলে, তুমি আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না তো বাবা। তুমি আমার আগে আগে যাও। আমি তোমার পেছনে আসছি। কোন সমস্যা নেই।

'এখানে একটা ম্যানহোল আছে।'

'আমি জানি ম্যানহোল আছে। ম্যানহোল থেকে গন্ধ আসছে—আমি গন্ধ পাচ্ছি।'

=======================================

'বাবার হাত ধরতে অসুবিধা কী?'

'কোন অসুবিধা নেই আমি একা একা যেতে চাচ্ছি।'

'তুই বড়ই আশ্চর্য মেয়ে।'

'তুমিও বড়ই আশ্চর্য বাবা।'

আজ সুপ্তির স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বারোটায়। এটা এমন কোন সমস্যা না। দু'ঘণ্টা বসে থাকলেই বাবা চলে আসবেন। কিংবা সে যদি হেডমিসট্রেস আপাকে বলে, তাহলে আপা তাকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। দপ্তরীকে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। কিংবা আপনরা কেউ বাড়ি যাবার পথে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন এ রকম আগেও হয়েছে। সুপ্তি আধাঘন্টার মত ক্লাসেই বসে রইল। মেয়েরা সব চলে গেছে ক্লাস ফাঁকা। হঠাৎ তার মনে হল—একা একা বাড়ির দিকে রওনা হলে কেমন হয়? সে নিশ্চিত যে যেতে পারবে তার কোন সমস্যাই হবে না। এবং তারতো এটাই করা উচিত। সারা জীবন কি কেউ তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটবে। রাস্তা পার করিয়ে দেবে?

সুপ্তি স্কুল গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। তার একটু ভয় ভয় লাগছে যদিও সে জানে ভয়ের কিছুই নেই। ভয় পেলেই ভয়। জিয়োগ্রাফী আপা প্রায়ই বলেন—"বনের বাঘে খায় না। মনের বাঘে খায়।" আসল বাঘের চেয়ে মনের ভেতরে যে বাঘ বাস করে সেই বাঘ অনেক অনেক অনেক ভয়ংকর।

সুপ্তি কোন রকম সমস্যা ছাড়া বড় রাস্তায় এল। রাস্তা পার হল। চায়ের দোকান পার হয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল এইসময় একটা সমস্যা—হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে কে একজন তার গায়ে উঠে পড়ল। সুপ্তির হাত থেকে বইখাতা ছিটকে পড়ে গেল। সাইকেলওয়ালাও তার সঙ্গে পড়ে গিয়েছে এবং সে মনে হয় ভালই ব্যথা হয়েছে। সুপ্তি উঠে পড়েছে নিজে নিজে, কিন্তু সাইকেলওয়ালাকে লোকজন ধরে তুলল। সে রাগী গলায় বলল, দেখেশুনে চলতে পার না। তুমি কি আন্ধা। দেখতেছে সাইকেল নিয়ে আসতেছি। তারপরও সরে না।

সুপ্তি বলল, আপনি হর্ণ দেননি কেন?

'হর্ণ দেব কেন? তুমি চোখে দেখ না? চোখ নাই?'

সুপ্তি প্রায় বলেই ফেলেছিল তার চোখ আছে কিন্তু সে দেখতে পায়নি। সুপ্তি বলল না। কারণ হঠাৎ তার মনে প্রচণ্ড একটা ভয় ঢুকে গেছে। সে দিক ঠিক করতে পারছে না। সে কোন দিকে যাবে। সোজা যাবে, না পেছন দিকে যাবে? তার এরকম হল কেন? আশেপাশে কোথাও একটা সাইকেল পার্টস এর দোকান থাকার কথা। সেটা কোন দিকে?

==

হাতের ছিটকে পড়া বইগুলি তোলা দরকার। বইগুলি কোথায় পড়েছে? জ্যামিতি বক্সের আশেপাশে ? জ্যামিতি বাক্স কোথায় পড়েছে সে জানে। পড়ার শব্দ শুনেছে। বইগুলিও শব্দ করেই পড়েছে। তবে অনেকগুলি বই। বই পড়ে যাবার শব্দ একরকম। জ্যামিতি বাক্সের শব্দ আলাদা। সুপ্তি নিচু হয়ে জ্যামিতি বাক্স তুলল। বই তোলার জন্যে এদিক ওদিক হাত দিচ্ছে ওম্নি একজন বলল, এই মেয়ে আন্ধা। সুপ্তির শরীর শক্ত হয়ে গেল। বই না তুলেই সে উঠে দাঁড়াল। সুপ্তি লক্ষ্য করল অনেকদিন পর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে এতগুলি লোকের সামনে কেঁদে ফেললে সমস্যা হবে। মনে হচ্ছে সত্যি চোখে পানি এসে যাবে। যে করেই হোক চোখের পানি আটকাতে হবে।

'ও আল্লা সত্যি চক্ষে দেখে না। এই তুমি একলা কই রওনা হইছ। তোমার বাড়ি কোনখানে ?'

সুপ্তি বাসায় ফিরল রিকশা করে। যে ছেলে সাইকেলে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়েছে সে সাইকেলে করে তার পেছনে পেছনে এসেছে। খুবই বিরক্তিকর ছেলে। পেছনে থেকে সারাক্ষণ কথা বলছে—

'কী নাম তোমার ?'

'সুপ্তি।'

'তুমি আমার খুব রাগ করেছ তাই না ?'

'না।'

'আমি জানি রাগ করেছ। আমি আসলেই বুঝতে পারিনি।'

'আমি রাগ করিনি।'

'তুমি কি সব সময় এ রকম একা একা চলাফেরা কর। এটাতো ঠিক না।'

'আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন ? আপনি চলে যান।'

'তোমাকে বাসায় পৌছে দিয়ে আসি।'

'পৌছতে হবে না।'

'পৌছাতে হবে কি হবে না, সেটা আমি বুঝব। সুপ্তি শোন আমার নাম জহির। আমি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

'নেত্রকোনায় আমার দাদার বাড়ি। দাদা অসুস্থ উনাকে দেখতে এসেছিলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ ?'

'আমি তো আপনাকে বললাম রাগ করিনি। আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। সামনের টিনের বাড়িটা আমাদের আপনি এখন যান।'

==

'তুমিতো চোখে দেখতে পাও না। তুমি বুঝলে কী করে সামনের বাড়িটা তোমাদের ?'

'আমি অনুমানে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি চোখে দেখ না ?'

'না।'

'আমার নামটা তোমার কি মনে আছে—জহির।'

'আপনার নাম মনে রেখে কী হবে ?'

বলেই সুপ্তি ঘরে রিকসা থেকে নামল। রিকসা ভাড়া দেবার সময় পেল না, জহির দিয়ে দিল। সুপ্তি বলল, আপনি এখন চলে যান। অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছেন। আর করবেন না। সুপ্তি ঘরে ঢোকার পরেও জহির কিছু সময় লজ্জিত মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

দুপুরে ম্যাজিশিয়ান ভাত খাচ্ছে আর সুপ্তি খুব আগ্রহ করে বলছে আজ সে কী করে একা একা হেঁটে চলে এসেছে। পথে সামান্য সমস্যা হয়েছিল তবে সেই সমস্যা সামাল দেয়া গেছে। ম্যাজিশিয়ান বলল, একা একা আসতে পেরে তুমি খুব খুশি ?

সুপ্তি বলল, হ্যাঁ খুশি। আমি অন্যসব মানুষের মতো চলাফেরা করতে চাই। কেউ যেন কোনদিন বুঝতে না পারে যে আমার কোন সমস্যা আছে।

ম্যাজিশিয়ান বলল, তা তুমি করতে পারবে।

'কী করে বললেন ?'

'আমি অনেক কিছু বলতে পারি।'

সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল, আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন কী জন্যে? আপনি মানুষ না আপনি গাছ এই জন্যে?

'তোমার বিশ্বাস হয় না, তাই না ?'

'না হয় না, কারণ আমি তো আর গাছ না, আমি মানুষ। মানুষদের অনেক বুদ্ধি। তারা চট করে কিছু বিশ্বাস করে না। তার একটা কথা বলি? আপনি আমাদের মতোই সাধারণ একজন মানুষ। একটাই তফাৎ, আপনি সুন্দর ম্যাজিক জানেন। আমরা জানি না। ম্যাজিক জানলেই মানুষ অন্য রকম হয়ে যায় না।'

'সুপ্তি শোন, আমি কিন্তু আসলেই মানুষ না।'

সুপ্তি বলল, মানুষ না হলে আপনি কে?

'আমি তো আগেও তোমাকে বলেছি। আমি আসলে গাছ।'

==

সুপ্তি গম্ভীর মুখে বলল, বেশি বেশি গাছ গাছ করবেন না-তো। বেশি বেশি গাছ গাছ করলে আমরা আপনাকে কেটে লাকড়ি বানিয়ে সেই লাকড়ি দিয়ে হয়তো রেঁধে খেয়ে ফেলব।

বলতে বলতে সুপ্তি হেসে গড়িয়ে পড়ল। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা তাকিয়ে আছে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। তার বড় বড় চোখ চক চক ঝক ঝক করছে। সেই চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতর হঠাৎ ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগে।

মবিন উদ্দিন বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যার আগে আগে। তার মুখে লজ্জিত ভাব। হাতে কাপড়ের প্যাকেট।

সুরমা বললেন, প্যাকেটে কী?

মবিন উদ্দিন ইতস্ততঃ করে বলরেন, সুপ্তির জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। মেয়েটা অনেকদিন থেকে শাড়ি শাড়ি করছিল।

'ভাল করেছ।'

'তোমার জন্যেও একটা শাড়ি কিনেছি। দেখতো রংটা পছন্দ হয় কি-না। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি। ওকে দিয়ে আস।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বলল, সবার জন্যে কাপড় জামা ব্যাপার কী?

'কোন ব্যাপার না। কিনলাম।'

'টাকা পেয়েছ কোথায়?'

'ছিল কিছু। শাড়িটা পছন্দ হয়েছে?'

সুরমা আনন্দিত গলায় বললেন, খুব পছন্দ হয়েছে।

'অজুর পানি দাও। মাগরেবের নামাজ পড়ব।'

সুরমা অজুর পানি দিতে দিতে বললেন, তুমি যে কবিরাজী অষুধটা দাও আমার মনে হয় অষুধটা কাজ করছে। সুপ্তির ব্যথা উঠেছিল অল্প কিছুক্ষণ ছিল। বেশি হলে বড়জোর এক মিনিট। তারপর চলে গেল।

'বল কী এটাতো খুবই আনন্দের খবর।'

'আনন্দের খবরতো বটেই। আমি দশ রাকাত শোকরানা নামাজ পড়েছি।'

'সুপ্তি কোথায়?'

'বাবলুর সঙ্গে গল্প করছে। ডাকব?'

'না থাক ডাকার দরকার নেই। শাড়িটা ওকে দাও—পরুক। দেখি মেয়েকে কেমন লাগে। ভাল কথা—আব্দুল মজিদ কি এসেছিল?'

==

'না তো। উনার আসার কথা না-কি?'

'হুঁ। আসলে বসিয়ে গল্প-টল্প কর। আমার নামাজ শেষ হতে দেরি হবে। সারাদিনের নামাজ কাজা হয়েছে।'

মবিন উদ্দিন অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়লেন। নামাজে বসেই সুপ্তির আনন্দের চিৎকার শুনে বুঝলেন, তার শাড়ি খুব পছন্দ হয়েছে।

তাঁর নামাজ বোধহয় হচ্ছে না। মন বাইরে চলে যাচ্ছে। আব্দুল মজিদ এসেছে এটাও নামাজে বসে টের পেলেন। তার সঙ্গে সুপ্তির যে কথাবার্তা হচ্ছে তাও শুনতে পাচ্ছেন।

'ফুপা কেমন আছেন?'

'খুব ভাল আছি মা।'

'ফুপা দেখেন বাবা আমার জন্যে একটা শাড়ি কিনে এনেছেন। কী সুন্দর রঙ দেখেছেন? বাবা কখনো ভাল কিছু কিনতে পারে না। এই প্রথম ভাল জিনিস কিনল।'

'রঙটা তো সুন্দর।'

'মা'র শাড়িটা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মা'র শাড়িটা আরো অনেক সুন্দর। মজার ব্যাপার কি জানেন ফুপা? মা'র বেশি পছন্দ আমার শাড়িটা, আবার আমার পছন্দ মা'র শাড়িটা।'

'দু'জনে বদলাবদলি করে নাও।'

'উহুঁ তা করব না।'

'ভাইজান কি ঘরে আছেন?'

'হুঁ আছেন। এই একটু আগে ফিরেছেন। নামাজ পড়ছেন। ফুপা আপনি বসুন। চা দেই।'

'কষ্ট না হলে দাও। ভাল কথা তোমাদের সঙ্গে একটা ছেলে নাকি থাকে? ম্যাজিক দেখায়?'

'হুঁ থাকে। তার সঙ্গে কথা বলবেন? ডাকব?'

'না এখন থাক। পরে কথা বলব। তুমি দেখ ভাইজানের নামাজ শেষ হয়েছে কি-না।'

মবিন উদ্দিন নামাজ শেষ করে বসার ঘরে গেলেন। আব্দুল মজিদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এবং যথারীতি কদমবুসি করল। বিনয়ের সঙ্গে আব্দুল মজিদ বলল, ভাইজান ভাল আছেন?

মবিন উদ্দিন বললেন, ভাল আছি। তুমি বোস। তাঁর মাথার ভেতর একটা ধাক্কার মত অনুভব করলেন। তাঁর সমস্ত মাথা ঘুরে উঠল। কানের ডগা ব্যথা করতে লাগল। এবং তিনি অসম্ভব বিস্ময়ের সঙ্গে আব্দুল মজিদের দিকে তাকালেন। কারণ তার মনে হল তিনি আব্দুল মজিদ মনে মনে কী ভাবছে সব বুঝতে পারছেন। এটা কি তাঁর মনের কল্পনা, না তিনি সত্যি বুঝতে পারছেন। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারার কোন কারণ নেই। অথচ তিনি যে মনের কথা বুঝতে পারছেন তা সত্যি। এখানে কোন ভুল নেই।

আব্দুল মজিদ মনে মনে ভাবছে—ছাগলা ব্যাটা কি টাকা জোগাড় করেছে। মনে তো হয় না। এদিকে শাড়ি ফাড়ি কিনে হুলুস্থুল। নামাজও পড়ল লম্বা চওড়া। নামাজে কাজ দিবে না। আমাকে চেনে না। অনেক দিন সবুর করেছি এইবার ধরলাম। ধরছি যখন ছাড়ব না।

মবিন উদ্দিনের খুবই অস্বস্তি লাগছে। একী কান্ড। আব্দুল মজিদ এইসব কী ভাবছে। সুপ্তি এসে চা দিয়ে গেল। আব্দুল মজিদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, মা চা ভাল বানিয়েছ। অনেক দিন পর ভাল চা খেলাম। তোমার ফুপু রান্না বান্নায় ভাল। চা বানাতে দাও—আর পারবে না। তুমি একদিন গিয়ে তোমার ফুপুকে চা বানানো শিখিয়ে দিও গো মা।

মবিন উদ্দিন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, আব্দুল মজিদ মনে মনে অন্য কথা বলছে। সে বলছে—এটা কী বানিয়েছে? ধামড়ি মেয়ে চা বানানো শিখেনি। কয়েকটা পাতা দিয়ে পানি গরম করলেই চা হয়ে গেল! এই চা খাওয়া আর চিনি দিয়ে ঘোড়ার পিসাব খাওয়া এক জিনিস।

আব্দুল মজিদ হাসিমুখে তাকাচ্ছে। মবিন উদ্দিন সেই হাসি দেখে শিউরে উঠলেন। মানুষের ভেতরের এবং বাইরের রূপের এত তফাৎ? মানুষ এত অদ্ভুত!

'ভাইজান টাকাটার কি জোগাড় হয়েছে?'

মবিন উদ্দিন বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন ভাইজান। খুব টেনশানে ছিলাম। কী যে ভাল লাগছে। মনে হল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।'

মবিন উদ্দিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, আব্দুল মজিদের মনের কথা সম্পূর্ণ অন্য। আব্দুল মজিদ বলছে—গাধাটা বলে কী টাকা জোগাড় করে ফেলেছে। পেয়েছে কোথায়? জমিজামা বিক্রি করেছে? না-কি দোকান বেচে দিয়েছে। দোকান বিক্রি করলে সবার মনটন খারাপ থাকতো। শাড়ি ফাড়ি কিনে আমোদ-ফূর্তি করত না। জমা টাকা? গাধাটার এত টাকা ছিল? ইস আগেই টাকাটা নেয়া উচিত ছিল।

==

'ভাইজানের টাকার জোগাড় করতে কষ্ট হয় নি তো?'

'না কষ্ট হয় নাই।'

মবিন উদ্দিন বুঝতে পারছেন আব্দুল মজিদ মনে মনে বলছে—আচ্ছা ব্যাটা কি টাকাটা সত্যি জোগাড় করেছে? না-কি এখনি বলবে, মজিদ টাকাটা একজনের দিয়ে যাবার কথা। এখনো আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক তুমি চলে যাও। আমি কাল পরশু নিয়ে আসব। এইসব বলে লাভ হবে না। আমি যাচ্ছি না।'

মবিন উদ্দিন বললেন, তুমি একটু বোস আমি টাকাটা নিয়ে আসি।

আব্দুল মজিদ বসে রইল। তার চোখে মুখে বিস্ময়। মবিন উদ্দিন পাঁচশ' টাকার দু'টা বান্ডিল এনে মজিদের হাতে তুলেন।

'টাকাটা গুণে নাও মজিদ।'

'ছিঃ ছিঃ কী বলেন। আপনি টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা গুণতে হবে না-কি? আমি যেমন মানুষ, ফেরেশতা টাকা দিলেও গুণে নেই। তবে আপনার ব্যাপার ভিন্ন। এই জীবনে মানুষ তো কম দেখিনি ভাইজান। কিন্তু আপনার মত দেখি নাই। রাহেলাকে ঐদিন বলছিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ের উকিল বাপ করতে হবে ভাইজানকে। তাঁর মত একটা মানুষকে উকিল বাপ পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।'

মবিন উদ্দিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে আব্দুল মজিদ মনে মনে ভাবছে—ব্যাটা তোকে পাম দিয়ে আকাশে তুলে দিলাম। তুই আসলে কী জিনিস সেটা আমি যেমন জানি তুইও জানিস। তুই হলি হাদারাম নাম্বার ওয়ান। একটা টেংরা মাছের মাথায় যে বুদ্ধি তোর বুদ্ধি তার চেয়েও কম।

আব্দুল মজিদকে বিদেয় করে মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ তাঁর মনে প্রচন্ড একটা সন্দেহ ঢুকেছে। তার মনে হচ্ছে—আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারার ব্যাপারে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটির কোন হাত আছে।

মবিন উদ্দিনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবলু কেমন করে যেন হাসল। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল। মবিন উদ্দিন তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

==

মবিন উদ্দিনের এখন প্রধান কাজ হল—নেত্রকোনা রেল স্টেশনে বসে থাকা। তিনি সকালবেলা নাশতা খান। খেয়ে খুব তাড়া আছে এমন ভঙ্গিতে বের হয়ে আসেন। দেরি হলে খানিকটা রাগারাগিও করেন—দোকান খুলতে হবে না? কাস্টমার দু'একটা এলে সকালবেলার দিকেই আসে। তোমাদের নিয়ে তো দেখি যন্ত্রণায় পড়লাম। সামান্য নাশতা দিতেই দুপুর।

দোকান বিক্রির কথা তিনি সুরমাকে এখনও বলেননি। কীভাবে বলবেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনটা কীভাবে চালাবেন তার পরিকল্পনার জন্যে সময় দরকার। চিন্তা-ভাবনা দরকার। সেই চিন্তা-ভাবনার জন্যেই রেল স্টেশনে আসা।

রেল স্টেশনের উত্তর প্রান্ত নিরিবিলি। বিশাল এক রেন্ট্রি গাছ। নীচে যাত্রীদের বসার জন্যে কংক্রিটের বেঞ্চ বানানো আছে। তিনি একটা খবরের কাগজ কেনেন। ধীরে সুস্থে কাগজ পড়েন। সবচেয়ে আগে পড়েন হারানো বিজ্ঞপ্তি। তাঁর ইদানিংকালে মনে হচ্ছে হারানো বিজ্ঞপ্তি পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন দেখবেন ম্যাজিশিয়ানের ছবি ছাপা হয়েছে। তার বাবা-মা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—

সন্ধানপ্রার্থী

> টুনু তুমি যেখানেই থাক ফিরিয়া আস। তোমার মা শয্যাশায়ী। তোমার কনিষ্ঠ ভগ্নির বিবাহ ঠিক হইয়াছে। তোমার কোন ভয় নাই ফিরিয়া আসিলে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাস করা হইবে না। অর্থের প্রয়োজন হইলে টেলিগ্রামে জানাও।
>
> ইতি— তোমার পিতা-মাতা।

এখনও এধরনের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েনি। কাগজ পড়া শেষ হলে ভাবতে বসেন—কী করা যায়? যখন ট্রেন আসে ভাবনা চিন্তায় বাধা পড়ে। যাত্রীদের

==

ওঠা-নামা, হৈ চৈ। সেই হৈ চৈ দেখতেও তাঁর ভাল লাগে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সুপ্তি একটু বড় হলে, তার বিয়ে দিয়ে দেয়া যেত। এমনতো না যে অন্ধ মেয়েদের বিয়ে হয় না। সবারই বিয়ে হয়। আল্লাহপাক সবকিছু জোড়া মিলিয়ে পাঠান। প্রতিটি মেয়ে পাখির জন্যে থাকে একটা পুরুষ পাখি তেমনি প্রতিটি মেয়ের জন্যে একজন স্বামী থাকে। আল্লাহপাক নিজেই জোড়া মিলিয়ে দেন। কাজেই সুপ্তির অবশ্যই বিয়ে হবে। সুপ্তির বিয়ে হয়ে গেলে সংসারে মানুষ থাকে মাত্র দু'জন। তিনি আর সুপ্তির মা। তারা দু'জন গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে পারেন। গ্রামের বসতবাড়ি ঠিকঠাক করে সেখানে থাকা। জমির কিছু আয় আছে। একটা পুকুর আছে। পুকুরে মাছের চাষ করতে পারেন। জমি বর্গা না দিয়ে নিজেরাই চাষ করবেন। বাবলু আছে—সে সাহায্য করবে...

চিন্তার এই পর্যায়ে মবিন উদ্দিন থমকে যান। বাবলু তাদের সঙ্গে আছে এটাতো ঠিক না। বাবলু কে? কেউ না। হুট করে যে ভাবে এসেছিল—সেই ভাবেই চলে যাবে। তিনি যদি আজ তাকে যেতে বলেন সে আজই যাবে।

বাবলু ছেলেটার ব্যাপারেও একটা কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। আরো আগেই নেয়া উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। বাবলু চলে গেলে সুপ্তি এবং সুপ্তির মা দু'জনই কষ্ট পাবে। কষ্ট পেলেও কিছু করার নেই। এই সংসারে বাস করতে হলে মাঝেমধ্যে কষ্ট পেতে হয়। সংসারের অনেক নিয়মের একটা নিয়ম হল কষ্ট পাওয়া। শুধু তারা কেন—তিনি নিজেও কষ্ট পাবেন। ছেলেটার উপর তাঁর মমতা পড়ে গেছে। মমতার কারণেই তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাঁর মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন আসে, তিনি সব প্রশ্ন চাপা দিয়ে রাখেন। নিজেকে এই বলে বুঝান যে বেশী কৌতূহল ভাল না। অতিরিক্ত কৌতূহলের কারণেই আদম এবং বিবি হাওয়া গন্ধম ফল খেয়েছিলেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন—ফল খেলে কী হয়। তাদের সেই অতিরিক্ত কৌতূহলের ফল তাঁরা হাতে হাতে পেয়েছেন। বেহেশ্‌ত থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন। কৌতূহলের শাস্তি শুধু যে তাঁরা পেয়েছেন তা না। তিনিও পাচ্ছেন। আদম হাওয়ার কৌতূহল যদি কম থাকতো তাহলে এখন তাঁকে রেল স্টেশনে বসে দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হতে হত না। তিনি পরম সুখে বেহেশতে বাস করতেন। ফল-ফ্রুট খেতেন।

রেল স্টেশনে বসে তিনি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কথাই বেশি ভাবেন। ব্যাপারটা কী? সে কে? তার যে কিছু কিছু ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত। আবার কিছু ব্যাপারে নিশ্চিত না। ছেলেটাকে পুরোপুরি

বিদেয় করে দেবার আগে তিনি সেইসব ব্যাপার জেনে নেবেন। কী জিজ্ঞেস করবেন কীভাবে করবেন—তিনি সেইসব ব্যাপার ভাবার চেষ্টা করেন। প্রশ্নগুলি গুছিয়ে রাখেন।

তিনি ঠিক করেছেন যাদুকর ছেলেটাকে নিয়ে এক সকালে রেল স্টেশনে আসবেন। তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন তা বাড়ির কাউকে বলবেন না। রেল স্টেশনে এনে এই বেঞ্চিতে বসাবেন এবং নরম গলায় বলবেন—বাবা শোন। তোমাকে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। তুমি তা ভালই জান—এখন কথা হচ্ছে কী...

বাকিটা বলার দরকার পড়বে না, সেই ছেলে অবশ্যই সব বুঝে ফেলবে। সে নিজ থেকেই বলবে—আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি। তখন তিনি তার জন্যে একটা টিকিট কেটে আনবেন। ময়মনসিংহ যেতে চাইলে ময়মনসিংহের টিকেট, ঢাকা যেতে চাইলে ঢাকার টিকিট। তারপর তাকে ট্রেনে তুলে দেবেন। কিছু টাকাও তার হাতে দিয়ে দেবেন। হাজারখানেক টাকা। আরো বেশি দিতেন, কিন্তু তাঁর সামর্থ নেই।

ছেলেটাকে কিছু জিজ্ঞেস করা বোধ হয় ঠিক হবে না। সে বিব্রত হবে। যাবার মুহূর্তে তাকে বিব্রত করে কী লাভ? যদিও তাঁর অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। বিশেষ করে গাছের ব্যাপারটা। সে নিজেকে গাছ বলে কেন? এটা কি কোন ঠাট্টা? না-কি সে সত্যি সত্যি গাছ? তা কী করে হয়? মানুষ গাছ হবে কীভাবে?

একদিন তিনি বারান্দায় বসে আছেন হঠাৎ শুনলেন, সুপ্তি ছেলেটাকে বলছে—গাছ ভাইয়া আমার বই-এর মলাট লাগিয়ে দাও।

তিনি সুপ্তিকে ডেকে বললেন, গাছ ভাইয়া ডাকছিস কেন? গাছ ভাইয়াটা কী?

'উনি নিজেকে গাছ বলেন তো তাই গাছ ভাইয়া বলে ক্ষেপাই।'

'বাবলু নিজেকে গাছ বলে?'

'হুঁ। বলে আমি মানুষ না, আমি গাছ?'

'সে গাছ হবে কেন?'

'আহ্ বাবা তুমিও দেখি কিছু বোঝ না। ঠাট্টা করে বলে। মানুষ কি কখনো গাছ হয়?'

'ঠাট্টা করে বলে?'

'অবশ্যই ঠাট্টা করে বলে। তোমার কী ধারণা—উনি সত্যি গাছ?'

===================================

মবিন উদ্দিনের কোনো ধারণা নেই। তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। বাবলু যদি তাকে বলে—আমি কাঁঠাল গাছ। তিনি হয়তোবা বিশ্বাস করবেন। তার গা থেকে কাঁঠাল বের হলেও তেমন অবাক হবেন না। পেরে ঘরের কোণায় রেখে দেবেন পাকাবার জন্যে।

দুপুর একটার মতো বাজে। মবিন উদ্দিন খবরের কাগজ ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষিধে পেয়েছে—বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবেন। কিছুক্ষণ ঘুমাবেন। ঐ দিন সুরমা বলছিল—আচ্ছা এখন তুমি আর দুপুরের পর দোকানে যাও না কেন?

'বিক্রিবাটা নেই। কাজেই যাই না। রেস্ট নেই। তাছাড়া শরীরটাও ভাল না।'

'বাবলুকে পাঠিয়ে দাও, ও দোকানে বসুক। দিনের পর দিন দোকান বন্ধ রাখলে লোকজন ভাববে তুমি দোকান বিক্রি করে দিয়েছ।'

মবিন উদ্দিন রাগী গলায় বললেন, দোকান বিক্রি করব কেন ? কী সব আজগুবি কথা বল।

'হঠাৎ এমন রেগে গেলে কেন? রাগার মতো কিছুতো বলিনি। তোমার শরীরতো আসলেই খারাপ করেছে। আজকাল খুব অল্পতেই রেগে যাচ্ছ। তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টাইতো করছি—তুমি এসে বকবক করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।'

'আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ঘুমাও।'

সুরমা চলে যায় ঠিকই, কিন্তু যাবার আগে কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে। সে কি কিছু আঁচ করছে? আঁচ করা বিচিত্র না। এত বড় ঘটনা বেশিদিন গোপন করে রাখা যাবে না। প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তাঁরই উচিত সুরমাকে জানানো। কীভাবে জানাবেন মাথায় আসছে না।

মোহনগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ আপ ট্রেন আসছে। স্টেশনে তুমুল ব্যস্ততা। চার-পাঁচ কামরার ছোট্ট ট্রেন, প্ল্যাটফরমে চার-পাঁচশ যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না, অথচ স্টেশনের সব যাত্রী ট্রেনে উঠে যাবে। কীভাবে উঠবে সেটাও এক রহস্য। আসলে পৃথিবীটাই রহস্যময়। কালো যাদুকরের রহস্যই একমাত্র রহস্য না। মবিন উদ্দিন বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

দরজা খুলে দিলেন সুরমা।

=======================================

সুরমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। চোখ ফোলা ফোলা। অনেকক্ষণ কাঁদলেই চোখ এমনভাবে ফুলে উঠে। মবিন উদ্দিন শংকিত গলায় বললেন, তোমার কী হয়েছে?

সুরমা ধরা গলায় বললেন, কিছু হয়নি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মবিন উদ্দিন নিচু গলায় বললেন, কী কথা ?

'খাওয়া-দাওয়া কর তারপর বলব।'

'এখনি বল শুনি।'

'তুমি নাকি রোজ স্টেশনে বসে থাক ?'

'কে বলেছে?'

'কে বলেছে সেটা পরের কথা। বসে থাক কি-না সেটা বল।'

'হ্যাঁ বসে থাকি।'

'স্টেশনে বসে কী কর?'

'খবরের কাগজ পড়ি।'

'খবরের কাগজ পড়ার জন্যে স্টেশনে যেতে হয়। আগেতো দোকানে বসেই কাগজ পড়তে। এখন দোকানে বস না কেন?'

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। চুপ করে থাকা ছাড়া তাঁর পথও নেই। কী বলবেন? সুরমা এমনভাবে তাকাচ্ছে যে তাঁর তৈরী মিথ্যা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

'তুমি না-কি দোকান বিক্রি করে দিয়েছ?'

হুঁ।'

'কেন?'

'আব্দুল মজিদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম। তার মেয়ের বিয়ে, টাকাটা তাকে দেয়া দরকার।'

'টাকা কবে ধার করেছিলে?'

'অনেকদিন আগেই নিয়েছিলাম। তোমাকে বলা হয়নি।'

'আমাকে তো তুমি কিছুই জানাও না। কেন জানাও না? এই ব্যাপারটা জানাতে কি কোনো সমস্যা ছিল?'

'না ছিল না।'

'ছিল না, তাহলে জানাওনি কেন?'

'সুপ্তি কোথায়?'

'সুপ্তি কোথায় জিজ্ঞেস করছ কেন? আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি আমাকে কখনো কিছু জানাও না কেন?'

==

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। সুরমা বললেন, এখন আমরা খাব কী? বাঁচব কীভাবে কিছু ভেবেছ?'

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। সুরমার কঠিন আক্রমণ সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। সুপ্তি থাকলে ভাল হত। সে বাবাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। মবিন উদ্দিন অসহায় বোধ করছেন।

সুরমা শান্ত গলায় বললেন, শোন আমি আজ বিকেলের ট্রেনে বারহাট্টা যাব। সুপ্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মবিন উদ্দিন বললেন, আচ্ছা।

এখন স্ত্রীর প্রতিটি কথায় রাজি হওয়াই হবে সর্বোত্তম পন্থা। বারহাট্টা তাঁর শ্বশুর-বাড়ি। সুরমা যদি সুপ্তিকে নিয়ে কয়েকদিন তার বাবা-মা'র কাছে যেয়ে থেকে আসে সেটা ভালই হবে। তার রাগ কমবে। তিনিও নিরিবিলি কিছুদিন ভাবার সময় পাবেন। চিন্তা-ভাবনার জন্যে তাঁকে আর রোজ রোজ স্টেশনে যেতে হবে না।

সুরমা তীব্র গলায় বললেন, মানুষকে তুমি মানুষ মনে কর না। মানুষকে ভাব—'গাছ'।

মবিন উদ্দিন মনে মনে বললেন, গাছকে এত তুচ্ছ মনে করো না। গাছ ভয়াবহ ব্যাপার। শুধু আমিই মানুষকে গাছ ভাবি না। অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের গাছ ভাবে। উদাহরণের জন্যে দূরে যেতে হবে না। উদাহরণ ঘরেই আছে।

'মুখ ভোতা করে থাকবে না। ভাত খাও। আমার কাজ-কর্ম আছে জিনিসপত্র গুছাতে হবে।'

'সত্যি সত্যি যাবে?'

'আমি কি তোমার সঙ্গে তামাশা করছি। তুমি কি আমার দুলাভাই?'

'বাবলু কোথায়?'

'ও ঘরেই আছে। কেন ওকে দরকার কেন?'

'এম্নি জিজ্ঞেস করলাম। কোন দরকার নেই।'

'দরকার তো থাকবেই না। কাউকেই তোমার দরকার নেই। তুমি একাই একশ। তুমি তো মহামানব।'

মবিন উদ্দিন একা একা খেলেন। এবং যথারীতি শুয়ে পড়লেন। দোকান বিক্রির খবরটা যে তাকে বলতে হয়নি সুরমা নিজে নিজেই বের করেছেন এতে তাঁর ভালই লাগছে। আল্লাহ্ যা করেন ভালই করেন।

==

মবিন উদ্দিন চোখ বন্ধ করে আছেন। সুপ্তির সঙ্গে তাঁর মা'র কথা-বার্তা কানে আসছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি মা? নানার বাড়ি ?'

'একবার তো বললাম। আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ?'

'হঠাৎ যাচ্ছি কেন?'

'কাজ আছে তাই হঠাৎ যাচ্ছি।'

'আমার স্কুল খোলা মা।'

'থাকুক স্কুল খোলা।' অন্ধ মেয়ে তার আবার স্কুল স্কুল খেলা।'

'এমন বিশ্রী করে কথা বলছ কেন ?'

'মিষ্টি কথা শুনতে চাস ? যা তোর বাবার কাছে। সে মিষ্টি কথা বলবে।'

'আমাদের সঙ্গে আর কে যাচ্ছে?'

'আমি আর তুই।'

'সে-কী! বাবা যাবে না? গাছ ভাইয়া যাবে না ?'

সুরমা কী জবাব দিলেন, মবিন উদ্দিন ধরতে পারলেন না। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে ওরা আসলে যাবে না। বিকেল আসতে আসতে সুরমার রাগ পড়ে যাবে। সুপ্তি বাবাকে ছাড়া কোথাও যাবে না বলে বেঁকে বসবে। সব মিলিয়ে যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে। মবিন উদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেক দিন পর তাঁর গাঢ় ঘুম হল।

ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যাবেলা। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তিনি ডাকলেন—সুপ্তি। সুপ্তি। কেউ সাড়া দিল না। তিনি বিস্মিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন ভেতরের বারান্দায় মোড়ার উপর ম্যাজিশিয়ান বসে আছে।

'ওরা কোথায়?'

'বারহাট্টা গিয়েছে।'

'বারহাট্টা গিয়েছে মানে? কখন গেল?'

'বিকালের ট্রেনে।'

'তুমি কী বল? সুপ্তি আমাকে কিছু না জানিয়েই চলে গেল ?'

'আপনি ঘুমাচ্ছেন এই জন্যে মনে হয় জাগায়নি।'

'কবে আসবে কিছু বলে গেছে ?'

'না।'

মবিন উদ্দিন হতভম্ব হয়ে গেলেন। যত রাগই করুক সুরমা তাকে কিছু না বলে চলে যেতে পারল?

==

ম্যাজিশিয়ান বলল, ওরা কাল পরশু চলে আসবে। আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না।

'কাল পরশু চলে আসবে তোমাকে বলে গেছে?'

'জ্বি না। কিন্তু আমি জানি চলে আসবে।'

'কীভাবে জান?'

ম্যাজিশিয়ান চুপ করে রইল। মবিন উদ্দিন লক্ষ্য করলেন তিনি রেগে যাচ্ছেন। স্ত্রী কন্যার উপরের রাগটা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার দিকে চলে যাচ্ছে।

'চুপ করে আছ কেন? বল কীভাবে জান? না বলতে কোনো অসুবিধা আছে?'

'জ্বি-না বলতে অসুবিধা নেই।'

'শোন—তোমার ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগে না। তুমি যা জান তার নাম ম্যাজিক না, তার নাম যাদুবিদ্যা। যাদুবিদ্যা ভাল জিনিস না। যাদুবিদ্যা খারাপ বিদ্যা। এই বিদ্যার চর্চা করাও খারাপ। ধর্মে নিষেধ আছে।'

'আমি কোনো যাদুবিদ্যা জানি না।'

'ফালতু কথা বলবে না। অবশ্যই তুমি যাদুবিদ্যা জান? তুমি সুপ্তিকে বলেছ তুমি গাছ? বল নাই?'

'জ্বি বলেছি।'

'কী জন্যে বলেছ ? ঠাট্টা করে বলেছ?'

'ঠাট্টা করে বলিনি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি গাছ ?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলছে না। মাথা নিচু করে আছে। মবিন উদ্দিন চাপা গলায় বললেন, আচ্ছা যাও স্বীকার করলাম তুমি গাছ। গাছ কেন সেটা বল।

'এক দুই কথায় বলা যাবে না।'

'এক দুই কথায় বলা না গেলে বেশি কথাতেই বল। আরেকটা কথা...

মবিন উদ্দিনের কথা বলার আগেই ম্যাজিশিয়ান বলল, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি জানি। আপনি বলতে চাচ্ছেন—আমি যেন চলে যাই।

'তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি তাই চাই।'

'জ্বি আমি চলে যাব।'

'তুমি যাবে কোথায়?'

'ঠিক করিনি কিছু।'

'দেশের বাড়িতে চলে যাও। পথে পথে ঘুরবে কেন? বাবা মা'র কাছে যাও।'

'বাবা-মা নেই।'

==

'বাবা-মা না থাকলেও আত্মীয়-স্বজন তো আছে। তাদের কাছে যাও। এমন তো না যে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। পথে পথে ঘুরে যে ফকির তারও চল্লিশটা আত্মীয় থাকে।'

ম্যাজিশিয়ান হাসতে হাসতে বলল, 'আমার নেই।'

মবিন উদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার থাকবে না কেন? তুমি তো আকাশ থেকে নামনি। না-কি আকাশ থেকে নেমেছ?

ম্যাজিশিয়ান এখনও হাসছে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। ব্যস্ত ভঙ্গিতে কেউ কড়া নাড়ছে। কে এসেছে? সুরমা ফিরে এসেছে না-কী? বারহাট্টা থেকে এখন আসার কোন ট্রেন নেই—তবে বাসে করে চলে আসতে পারে। সুরমা বাবার বাড়িতে পৌঁছেই হয়ত বুঝতে পেরেছে সে কাজটা ভাল করেনি। তারপর বাসে করে চলে এসেছে। তবে ম্যাজিশিয়ান বলছিল তারা কাল-পরশু আসবে। ম্যাজিশিয়ানের কথাতো ভুল হবে না।

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে এসেছে?

ম্যাজিশিয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনার বোনের স্বামী মজিদ সাহেব এসেছেন। মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের চোখে মুখে সূক্ষ্ম হাসি লক্ষ্য করলেন। ম্যাজিশিয়ানরা বড় ধরনের কোন ম্যাজিক দেখাবার আগে আগে যে বিশেষ ভঙ্গিতে হাসে। সেই ভঙ্গির হাসি।

মবিন উদ্দিন তীব্র গলায় বললেন, না দেখে বলে ফেললে ? তারপরেও বলতে চাও তুমি যাদুবিদ্যা জান না ?

মবিন উদ্দিন দরজা খুললেন। হ্যাঁ আব্দুল মজিদই এসেছে। সে অন্যদিনের মতোই হাসিখুশি। তার মুখ উজ্জ্বল। হাতে মিষ্টির হাড়ি।

'কী খবর আব্দুল মজিদ?'

'জ্বি খবর ভাল।'

'হাতে কী?'

'রসোগোল্লা। সুপ্তির জন্যে এনেছি। নিধু সাহার কাপড়ের দোকানে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনাদের খোঁজ নিয়ে যাই। চায়েরও পিপাসা পেয়েছে। এক কাপ চাও খেয়ে যাই।'

'চা খাওয়াতে পারব না। সুরমা-সুপ্তি কেউ বাসায় নাই।'

'সে-কী! ওরা কোথায়?'

'বারহাট্টা গিয়েছে।'

==

'সঙ্গে কে গিয়েছে, ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা? ভাইজান আপনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছেন। ছেলেটাকে এখনও তাড়ান নাই?'

'ওই প্রসঙ্গ বাদ দাও।'

'বাদ দিব কেন? বাদ দেয়ার মতো বিষয় তো না। শেষ পর্যন্ত একটা কেলেংকারী হবে।'

'যখন হবে তখন দেখা যাবে। তুমি কি কোন কাজে এসেছ না এম্নি এসেছ?'

আব্দুল মজিদ বসতে বসতে বলল, একটা কাজেই এসেছি। বুঝলেন ভাইজান ওইদিন টাকাটা গুণে না নিয়ে ভুল করেছি। গুণে নেয়ার দরকার ছিল।

মবিন উদ্দিন হতভম্ব হয়ে বললেন, সে-কী টাকা কম ছিল না-কী?

আব্দুল মজিদ হাসতে হাসতে বলল, জ্বি না। একটা পাঁচশ টাকার নোট বেশি ছিল। ব্যাংকও মাঝে মাঝে ভুল করে। নোটটা নিয়ে এসেছি।

আব্দুল মজিদ মানিব্যাগ বের করল আর তখন ঠিক আগের বারের মতো আব্দুল মজিদ কী ভাবছে তিনি বুঝতে পারলেন। আব্দুল মজিদ ভাবছে টাকা ঠিকই ছিল তারপরেও পাঁচশ টাকা দিচ্ছি বুঝানোর জন্যে যে আমি মানুষটা অতি সৎ। আমার মধ্যে কোন অসৎ ব্যাপার নাই।

মবিন উদ্দিন বললেন, সত্যি সত্যি পাঁচশ টাকা ছিল?

'জ্বি ছিল।'

মবিন উদ্দিন টাকাটা হাতে নিলেন। মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি কি আসলেই আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারছেন, না এটাও তাঁর কল্পনা।

'ভাইজান একটা বিষয় শুনে খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি।'

'বিষয়টা কী?'

'শুনলাম আপনি না-কি দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে টাকা দেয়ার জন্যে দোকান বিক্রি করতে হল? ছি ছি।'

'না ছি ছি কিছু না। এম্নিতেও বিক্রি বাটা হচ্ছিল না।'

'এখন কী করবেন বলে ঠিক করেছেন?'

'গ্রামের বাড়িতে চলে যাব বলে ঠিক করেছি। কিছু ধানী জমি আছে। পুকুর আছে। শহরের এই বাড়ি বিক্রি করলে কিছু টাকা পাব।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না ভাইজান। পুকুরে যদি মাছের চাষ করেন—ভাল আয় হবে। আর আপনারা তিনজন মোটে মানুষ—আপনাদের আর খরচ কী?'

==

মবিন উদ্দিন কিছু বললেন না। এই আলোচনা চালিয়ে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না।

'পুকুরে গ্রাস কার্প ছাড়বেন, সিলভার কাপ ছাড়বেন, সরপুটিও ভাল হয়। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের এক অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নিয়ে আসব আপনার কাছে।'

'আচ্ছা।'

'মাছের চাষে অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন কর্মচারী রেখে দেবেন। আছে, আমার জানামতে বিশ্বাসী লোক আছে। হ্যাচারীতে কাজ করেছে। ওকে নিয়ে আসব।'

মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না, তার মাছের চাষ নিয়ে আব্দুল মজিদ এত উৎসাহী কেন ? রহস্যটা কী ? রহস্য কিছু নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তিনি ধরতে পারছেন না।

হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। আব্দুল মজিদ কি ভাবছে তিনি বুঝতে পারছেন। আব্দুল মজিদ এসেছে বাড়িটা কিনে নিতে। শহরের উপর ভাল জায়গায় বাড়ি। চারতলা দালান তুলে ভাড়া দিলে ভাল টাকা আসবে।

'ভাইজান!'

'বল।'

'দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন শুনে খুবই কষ্ট পেয়েছি। হুট করে বিক্রি করলেন, দামও তো ভাল পান নি।'

'তা ঠিক দাম ভাল পাই নি।'

'বাড়ি বিক্রি করার সময় তাড়াহুড়া করবেন না। আমাকে আগে জানাবেন।'

'তুমি কিনতে চাও? তুমি তো বলছিলে তোমার টাকা পয়সার সমস্যা।'

'সমস্যা তো আছেই। সমস্যা যাই থাকুক জোগাড় করব। আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তা ঠিক না। বাড়ি কবে-নাগদে বিক্রি করার কথা ভাবছেন?'

'এখনও এই বিষয়ে কিছু ভাবি নি।'

'দেরী করা ঠিক হবে না। দেরী করা মানে জমা টাকা খরচ করা। তাড়াতাড়ি ডিসিসান নিয়ে কাজ কর্ম শুরু করে দেয়া দরকার। আমি কালপরশুর মধ্যে হ্যাচারীর লোকের সঙ্গে কথা বলব। আপনার একটা ভাল ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না ভাইজান।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইজান আমি আজ তাহলে উঠি?'

==

মবিন উদ্দিন আব্দুল মজিদকে বিদায় দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। তাকে এখন লাগছে পাথরের মূর্তির মতো। মবিন উদ্দিনকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। মবিন উদ্দিন বললেন, তুমি কি কিছু বলবে ?

সে না সূচক মাথা নাড়ল।

মবিন উদ্দিন বললেন, তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে ?

'জ্বি দেব।'

'আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারছি—এটা কি সত্যি।'

'জ্বি সত্যি।'

'এটা কীভাবে সত্যি হয় ?'

'আমি আপনাকে সাহায্য করেছি।'

'তুমি এইসব শিখলে কীভাবে ?'

'আমি একটা খাতায় আমার ব্যাপারটা লিখেছি। খাতাটা আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি পড়বেন। পড়া শেষ হলে খাতাটা নষ্ট করে ফেলবেন।'

মবিন উদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু এইসব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না। মানুষ হবে সহজ, সরল স্বাভাবিক—এইসব কী?

'আমার দুর্ভাগ্য যে আমি অন্য রকম হয়ে গেছি।'

'কীভাবে হলে ?'

'আমি সব লিখেছি। পড়লেই আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। আমি চলে যাচ্ছি, আপনি পড়ুন। আজ রাতেই পড়ুন।'

'তুমি চলে যাচ্ছ তার মানে কি। কোথায় যাচ্ছ ?'

'বুঝতে পারছি না কোথায় যাচ্ছি। আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারও আছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

মবিন উদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কী করেছ যে তোমাকে ক্ষমা করতে হবে?

'আমি নিজেকে আপনার ছেলের মতো করে উপস্থিত করেছি। তার চেহারা তার গলার স্বর অনুকরণ করেছি। এমন কি নিজের নামও বলেছি টুনু। আমি এই ব্যাপারগুলি করতে পারি। আমার অনেক ক্ষমতা।'

==

'তুমি কি এখনি চলে যাচ্ছ? তুমি যে ভঙ্গিতে কথা বলছ তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে।'

'জ্বি আমি এখনি চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

'সুপ্তি আর তার মা'র সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে?'

'জ্বি।'

'তোমার কষ্ট হবে না? মন খারাপ করবে না?'

'আমি অর্ধেক বৃক্ষ, মানুষের আবেগ আমার নেই। আপনি যে স্নেহ করেছেন—সেই স্নেহ অপাত্রে করেছেন।'

মবিন উদ্দিন আগে লক্ষ্য করেন নি, এখন লক্ষ্য করলেন—ঠিক যে পোষাকে কাল যাদুকর এই বাড়িতে ঢুকেছিল সে সেই পোষাকেই পরে আছে। পাতলা একটা শার্ট, খালি পা। কাঁধে ছেড়া সুতা ওঠা কাপড়ের ব্যাগ। টুনুর মুখের কোন আদল তার মুখে এখন আর নেই। নিগ্রোদের চুলের মতো ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। চোখের শাদা অংশ অতিরিক্ত শাদা। মনে হয় অন্ধকারে জ্বলছে।

মবিন উদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, তোমার নাম কী?

'এখন আমার কোন নাম নেই। তবে এক সময় সুন্দর একটা নাম ছিল।'

'সেই নামটা কী?'

'টগর।'

কালো যাদুকর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। একবারও বলল না—আপনারা আমাকে পুত্র স্নেহে রেখেদিলেন। এই স্নেহের ঋণ আমি স্বীকার করছি।

সে এমনভাবে ঘর থেকে বের হল যেন কারো কাছেই তার কোন ঋণ নেই।

==

আমি আমার জীবনের অদ্ভুত একটা গল্প লিখছি। যারা গল্পটি পড়বেন তাদের যে বিশ্বাস করতে হবে এমন না। বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। আবার অবিশ্বাস করারও দরকার নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝিটা করলেই হল। আমরা সব সময় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে বাস করি। কে জানে হয়ত এই জগৎটাই সত্যি।

আমার মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। মা'র কোন স্মৃতি আমার মনে নেই। শুধু একটা স্মৃতি আছে—আমি একটা জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে আছি, মা আমার মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালছেন—আমার প্রচন্ড শীত লাগছে। আমি শীতে কাঁপছি। মাথায় পানি ঢালার সময় মা'র হাতের কাঁচের চুড়িতে টুন টুন শব্দ হচ্ছে। আমার কাছে মা'র স্মৃতি হচ্ছে—ঠান্ডা পানি ঢালার শব্দ, চুড়ির টুন টুন শব্দ। ব্যাস এই পর্যন্তই, মা'র চেহারার কোনো স্মৃতি আমার নেই। তিনি দেখতে কেমন ছিলেন? তাঁর কি মায়া মায়া চোখ ছিল ? তিনি কি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাখতেন ? কিচ্ছু জানি না।

মা'র মৃত্যুর দু'বছর পর বাবা আবার বিয়ে করেন। নতুন মা'র কথা আমার খুব মনে আছে।

নতুন মা'র চেহারা খুব সুন্দর ছিল। তিনি হাসি খুশি ধরনের ছিলেন। স্বভাবটা ছিল ছটফটে ধরনের। অনেকটা চড়ুই পাখির মত। কোথাও বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। নতুন মা আমাকে খুব আদর করতেন। আসল মা'র আদর কেমন তাতো জানি না—নতুন মা'র আদর পেয়েই আমার আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি আমাকে গ্রহণ করেছিলেন—বন্ধু হিসেবে, খেলার সাথী হিসেবে। নতুন মা'র বয়স অল্প ছিল। তাঁর খেলার সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। আমার বাল্যকাল এবং কৈশোর কেটেছে খুবই সুখে। আমার সুখ স্থায়ী হল না। আমার যখন তের বছর বয়স তখন নতুন মা' মারা গেলেন।

==

নিজের মা'র মৃত্যুতে আমি কষ্ট পাইনি। নতুন মা'র মৃত্যুতে আমি প্রথম কষ্ট পেলাম। নতুন মাও সম্ভবত অন্য ভূবনে যাত্রার আগে আমার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কারণ তিনি মৃত্যুর আগে আগে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন— আহারে আমি চইল্যা গেলে আমার টগররে কে দেখব ?

তখন তাঁর নিজের একটি মেয়ে আছে। তারও ফুলের নামে নাম—পারুল। খুবই আশ্চর্যের কথা একবারও তিনি তাঁর মেয়ের কথা বললেন না। একবারও বললেন না, আমার পারুলরে কে দেখব? তিনি কাঁদতে লাগলেন আমার কথা ভেবে।

মা'র মৃত্যুর পর বাবা আমাকে ডেকে বললেন—বুঝলি টগর, আমার কপালে সংসার নেই। বিয়েসাদী আর করব না। তোর ছোট বোনটাকে তো বড় করা লাগবে—দুইজনে মিলে পারব না?

আমি বললাম, পারব।

বাবা বললেন, শিশু মানুষ করা কঠিন ব্যাপার। দুইজনে মিলে এই কঠিন কাজটা সমাধা করতে হবে। উপায় কী? তবে মেয়ে তো, একটু বড় হলে দেখবি আমাদের আর তাকে পালতে হচ্ছে না—উল্টা সেই আমাদের পালছে। কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে তোর বোনটাকে বড় করতে হবে। আগের মতো আর বাইরে ঘোরাঘুরি করা যাবে না। বেশির ভাগ সময় এখন ঘরেই থাকতে হবে।

বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট-খাট ব্যবসা করতেন। কোন ব্যবসাতেই মন বসাতেন বলে মনে হয় না। একটা ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলে সেটা ছেড়ে তিনি অন্য ব্যবসা ধরতেন। তাঁর ঘুরে বেড়ানোরও খুব সখ ছিল। তাঁর কথা হল—মানবজীবন অল্প দিনের। এই অল্পদিনে যা দেখার দেখে নিতে হবে। মৃত্যুর পর দেখার কিছু নেই। দোজখে যে যাবে—সে আর দেখবে কী—তার জীবন যাবে আগুন দেখতে দেখতে। আর বেহেশ্‌তেও দেখার কিছু নেই। বেহেশ্‌তের সবই সুন্দর। যার সবই সুন্দর তার সৌন্দর্য বোঝা যায় না। সুন্দর দেখতে হয় অসুন্দরের সঙ্গে।

খুবই ভারী ধরণের কথা। বাবা ভারী ভারী কথা বলতে পছন্দ করতেন।

মা'র মৃত্যুর পর বাবার অস্থির স্বভাবের তেমন কোন পরিবর্তন হল না। তিনি আগের মতই রইলেন। বরং অস্থিরতা সামান্য বাড়ল। মূলত আমি একাই বোনের দেখাশোনা করতে লাগলাম। বাড়িতে একটা কাজের মহিলা ছিল। তাকে আমরা রহিমা খালা ডাকতাম। রহিমা খালা খুব দায়িত্ববান মহিলা ছিলেন। সংসার তিনি একাই সামলাতে লাগলেন। যদিও আগে বলেছি আমি বোনের

==

দেখাশোনা করতে লাগলাম আসল ঘটনা সেরকম নয়। আমার বোন একা একাই বড় হতে লাগল। সে খেলতো নিজের মনে—হেঁটে বেড়াতো নিজের মনে। তার স্বভাব চরিত্র এবং আচার আচরণে বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল। যা আমার কম বয়সের জন্যে আমি ধরতে পারিনি। রহিমা খালা ঠিকই ধরেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন—"পারুল জানি কেমন কইর‍্যা হাঁটা চলা করে। বগার লাহান ঠ্যাং ফেলে, কেমুন কইরা জানি দেহে। রহিমা খালা এই কথাগুলি নিজেকেই বলতেন। কাজেই আমিও তেমন গুরুত্ব দেইনি।

পারুলের যে অস্বাভাবিকতাটা আমার চোখে পড়ত তা হল সে অন্ধকারে সারাবাড়ি হেঁটে বেড়াতে পারত। ভাবটা এমন যেন সে অন্ধকারে দেখতে পায়। আসল ব্যাপারটা ছিল পুরো অন্যরকম। সে চোখে কিছুই দেখত না, সে জন্মান্ধ ছিল। তার টানা টানা সুন্দর চোখ দেখে এ ব্যাপারটা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। বাবা বেখেয়ালী ধরনের মানুষ তাঁর ধরতে পারার কথা নয়, আর আমার বয়সতো নিতান্তই অল্প। মা' বেঁচে থাকলে অবশ্যই ধরতে পারতেন।

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন পারুলের বয়স চার। আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লাম। অন্ধকারে তার অনায়াসে হাঁটাহাঁটির অর্থ তখনই পরিষ্কার হল। তার কাছে আলো এবং অন্ধকার আলাদা কিছু ছিল না। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও পারুলের অন্যসব ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। পাঁচ বছর বয়সেই সে সবকিছু নিজের মতো করে করতে পারত।

বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সংসারে এমনিতেই তাঁর মন ছিল না। এর পর মন আরও উঠে গেল। বেশিরভাগ সময়ই তিনি বাইরে বাইরে থাকতে শুরু করলেন। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন পারুল নিজের মনে খেলছে। নিজের মনে কথা বলছে। বাবা তাঁর মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। বড় বড় ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তাররা বললেন—জন্ম ত্রুটি, কনজেনিটাল ডিফেক্ট। কিছু করার নেই।

পারুল দেখতে পায় না এনিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সে ছিল মনের আনন্দে। ছোটাছুটি করছে—হৈ চৈ করছে। মনের আনন্দে গান করছে। 'ট' উচ্চারণ করতে পারত না বলে আমাকে সে ডাকত অগর ভাই। যখন 'ট' উচ্চারণ করতে শিখল তখনও আমি অগর ভাই হয়ে রইলাম। পারুলের অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র সঙ্গী। তার বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। একবার সে আমাকে বলল, অগর ভাই, আমাকে পড়া শেখাও। তখন আমি পড়ি

==

ক্লাস টেনে। আমার এমন কী বিদ্যা যে একটা অন্ধ মেয়েকে পড়া শিখাব? কতগুলি বর্ণ আছে—স্বরবর্ণ কিছু আছে ব্যাঞ্জন বর্ণ—এদের আলাদা ধ্বনি আছে। ধ্বনিগুলি তাকে শুনাতে পারব। কিন্তু বর্ণগুলি তো সে কোনদিন দেখবে না। কাগজের উপর বর্ণগুলি বড় বড় করে লিখে তার উপর দিয়ে পারুলের আঙুল বুলিয়ে নিলে সে কিছুটা আঁচ হয়ত পাবে। কিন্তু যুক্তবর্ণ বুঝাব কী করে? আর বুঝতে পারলেও এতকিছু সে মনে রাখবে কী করে? আমি খুবই অনাগ্রহের সঙ্গে কাগজে "অ" লিখে শুরু করলাম। এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম পুরো ব্যাপারটা পারুল শিখল অস্বাভাবিক দ্রুততায়। সে যত না আনন্দিত হল তার চেয়ে একশগুণ আনন্দিত হলাম আমি নিজে।

পারুল বেশিরভাগ সময় খুব হাসিখুশি থাকত। তবে সে সত্যি হাসিখুশি থাকত, না—হাসিখুশি থাকার ভান করত তা আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে মন খারাপ করত। মন খারাপটা বেশির ভাগ সময় হত যখন কোন একটা জিনিস সে বুঝতে চাইত অথচ আমি তাকে বুঝাতে পারতাম না। যেমন রঙ আসলে কী? পারুল জানতে চাইল, আম যখন কাঁচা থাকে তখন তার রঙ তোমরা বল সবুজ পাকলে হয় হলুদ। এর মানে কী? একটা কাঁচা আমের গন্ধ একরকম, পাকা আমের গন্ধ আরেক রকম এটা আমি বুঝতে পারি। গন্ধ না শুঁকে হাত দিয়ে ছুঁয়েও বোঝা যায় কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা। কিন্তু হাত দিয়ে না ছুঁয়ে, গন্ধ না শুঁকে দূর থেকে তুমি কী করে বলবে কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা?

'রঙ দেখে।'

'সেই রঙটা কী? একটা জিনিসের অনেকগুলি রঙ কেন হয়? কীভাবে হয়?'

আমি বুঝাতে পারি না। হতাশ বোধ করি। যে চোখে দেখতে পায় তার কাছে রঙের ব্যাপারটা যত সহজ, যে দেখতে পায় না তার কাছে এটা ততই কঠিন।

এক সময় লক্ষ্য করলাম পারুলের বেশিরভাগ প্রশ্নেরই আমি জবাব দিতে পারছি না। তার প্রশ্নগুলি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

'অগর ভাইয়া তুমি প্রায়ই বল চাঁদের আলো সুন্দর। তা হলে কি সূর্যের আলো অসুন্দর?'

'অসুন্দর না তবে চাঁদের আলো বেশি সুন্দর। চাঁদের আলো নরম।

'আলোর ভেতর নরম আর শক্ত কী? তুমি তো আর আলো হাত দিয়ে ধরতে পারছ না।'

'কথার-কথা বললাম।'

'সূর্যের আলো গায়ে লাগলে আমি বুঝতে পারি। চাঁদের আলো বুঝতে পারি না কেন?'

'ঐ যে বললাম চাঁদের আলো খুব হালকা।'

'হালকা বলছ কেন আলোর কি ওজন আছে?'

'পারুল আমি বুঝাতে পারছি না।'

'তুমি একবার বলেছিলে পৃথিবীতে সব মিলিয়ে মাত্র সাতটা রঙ। আসলেই কি তাই?'

'হ্যাঁ সাতটা রঙ। তবে একটা রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিলে নতুন রঙ তৈরি হয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'চিনির সঙ্গে যদি সামান্য লবন মেশানো হয় তাহলে খাবারে যেমন মিষ্টি স্বাদ থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে একটু লোনা স্বাদও থাকে। অনেকটা এ রকম।'

'তার মানে কি এই যে পৃথিবীতে রঙের কোনো সীমা নেই?'

'হ্যাঁ তাই।'

'আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

আমি তাকে বুঝাতে পারি না। আমি নিজে যেমন হতাশ হই—পারুল তার চেয়ে বেশি হতাশ হয়। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে তার হতাশা চেপে রাখার। সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না।

পারুল যতই বড় হতে থাকল তার ভেতর থেকে হাসি খুশি ভাব ততই কমে যেতে লাগল। এবং তার প্রশ্নগুলিও ততই অদ্ভুত হতে লাগল। যেমন সে একদিন জিজ্ঞেস করল—

'অগ্রু ভাইয়া একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে পছন্দ করে—মানে এই ইয়ে ধর ভালবাসে তখন কি সেই ভালবাসারও রঙ আছে?'

'না।'

'না কেন? সব কিছুর রঙ আছে ভালবাসার রঙ থাকবে না কেন? থাকতেই হবে। ভালবাসার খুব সুন্দর রঙ থাকবে। ঘৃণার থাকবে কুৎসিত রঙ। অবহেলার এক রকমের রঙ আবার অভিমানের অন্য রকম রঙ।'

আমি হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকি। পারুল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়। মনে হয় সে যেন রেগে যাচ্ছে।

===================================

'আচ্ছা আবেগের কোন রঙ নেই?'

'শব্দের? শব্দের কী কোন রঙ আছে?'

'গাছের পাতা যখন বাতাসে কাঁপে তখন কি তার রঙ বদলে যায় ?'

পারুল গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে—আমার মনে হয় শব্দের রঙ আছে। তোমরা ভালমত দেখতে পার না বলে বুঝতে পার না। বৃষ্টি পড়ার শব্দের এক রকমের রঙ, আবার পাখি যখন ডাকল তখন আরেক রকম রঙ। মুরগি যখন জবাই করার আগে চিৎকার করতে থাকে তখন তার চিৎকারের এক রকম রঙ। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় যে যখন ডাকে তখন অন্য রকম রঙ।'

আমি চুপ করে যাই পারুলও চুপ করে যায়। এবং একটা সময় আসে যখন এ জাতীয় কথাবার্তা সে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। বেশির ভাগ সময় সে কাটাতে থাকে আমাদের বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করি সে পুকুরের পাড় ঘেসে হাঁটে আর আপন মনে কথা বলে।

বাবা একদিন বললেন, মেয়েটার হল কী বলতো? পাগল হয়ে গেল নাকি? পুকুরের চারদিকে শুধু চক্কর দেয়। পুকুরটা কি কাবা শরীফ যে তার চারপাশে চক্কর দিতে হবে? নিষেধ করিস তো। কোন দিন পা পিছলে পুকুরে পড়বে। সাঁতার জানে না। একসিডেন্ট করবে।

বাবার কথা একদিন ফলে গেল। পারুল পা পিছলে পুকুরে পড়ে গেল। আমরা কেউ তা জানতেও পারলাম না। আমরা জানলাম দুপুরের পর যখন পারুল পুকুরে ভেসে উঠছে।

পারুল পা পিছলে পুকুরে পড়েছিল না-কি নিজে ইচ্ছে করে পুকুরে নেমে গিয়েছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। দৃষ্টিহীন মানুষ অসম্ভব সাবধানী হয়। কলার খোসায় পা পিছলে সাধারণ মানুষ পড়ে, দৃষ্টিহীন মানুষরা পড়ে না। তাছাড়া পুকুর পাড়ের মাটির প্রতিটি ইঞ্চি পারুলের পরিচিত। সে তার ক্ষুদ্র জীবনে খুব কম করে হলেও এক লক্ষবার পুকুরের চারদিকে হেঁটে ফেলেছে।

যে রাতে পারুল মারা যায় তার আগের রাতে আমার সঙ্গে সে যে সব কথা বলেছে তার থেকেও খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা দু'জন রাতের খাবার খাচ্ছি—বাবা বাইরে। তিনি রাতেই ফিরবেন, কিন্তু ফিরতে দেরি হবে। পারুল ভাত মাখতে মাখতে হালকা বলল, অগর ভাইয়া মৃত্যুর আগে আগে অন্ধ মানুষ নাকি চোখে দেখতে পায়। বধিরও কানে শুনতে পায় ? কথাটা কি সত্যি ?

আমি বললাম, কে বলেছে?

'রহিমা খালা বলেছে।'

'ঠিক বলেনি।'

পারুল গম্ভীর গলায় বলল, আমার মনে হয় ঠিকই বলেছি। মৃত্যুর আগে শেষবারের মত মানুষ প্রাণ ভরে পৃথিবী দেখবে এটাই স্বাভাবিক। বুঝলে ভাইয়া আমি আর কিছু চাই না শুধু একবারের মত রঙ ব্যাপারটা কী দেখতে চাই।

আমি নিজে মনে করি পারুল মারা গেছে—রঙ কী সেটা একবারের জন্যে হলেও দেখতে গিয়ে। আমার এই ধারণার কথা আমি বাবাকে বলিনি। বললে তিনি খুব কষ্ট পেতেন।

পারুলের মৃত্যুর পর বাবা এমন ভাব করলেন যেন তিনি খুশি হয়েছেন। পারুলকে কবর দেয়া হল পুকুর পাড়ে। কবর দেয়ার পরে বাবা আর আমি চুপচাপ বারান্দায় বসে আছি। বাবা বললেন—ভালই হয়েছে বুঝলি টগর। মেয়েটা মরে গিয়ে বেঁচেছে। আমি আসলে খুশিই হয়েছি। আই এ্যাম এ হ্যাপী ম্যান। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারতাম না, কষ্টে কষ্টে জীবন কাটত। তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আমি যতদিন থাকতাম মেয়েটাকে দেখতাম। তারপর আমি যখন মারা যেতাম তখন কী হত? তুই থাকতি তোর নিজের সংসারে নিয়ে। পারুল তোর সঙ্গে থাকলে তোর বৌ হয়ত সেটা পছন্দ করত না। ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'যা হয়েছে ভালই হয়েছে। ঠিক না টগর?'

'হুঁ ঠিক।'

'চুপচাপ বারান্দায় বসে থেকে কী করবি? যা ঘুমুতে যা।'

আমি ঘুমুতে গেলাম। বাবাও ঘুমুতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই শুনি বাবা বিকট চিৎকার করে কাঁদছেন। আমি বললাম, কী হয়েছে বাবা? বাবা বললেন, মেয়েটা একা একা ভয় পাচ্ছে।

আমি বললাম, চল আমরা দু'জন কবরের পাশে বসে থাকি।

বাবা তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে নেমে বললেন, চল যাই।

আমরা দু'জন বাকি রাতটা পারুলের কবরের পাশে চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমি ঘরে ফিরলাম জ্বর নিয়ে। তেমন জ্বর না, সামান্য শরীর গরম। মাথা ঝিমঝিম। সেই জ্বর আর কাটে না। এক দু'দিন ভাল থাকি আবার জ্বর আসে।

শরীর দুর্বল হতে থাকল। এক সময় চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল। কিছুদিন পর এমন অবস্থা হল যে আমি বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারি না। কিছুই খেতে

==

পারি না। সামান্য পানি মুখে দিলেও বমি হয়ে যায়। নানান ধরণের চিকিৎসা হতে থাকল। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, ইউনানী। আধি ভৌতিক চিকিৎসাও হল। কেউ কেউ বললেন—আমাকে জ্বীনে ধরেছে। সেই জ্বীন তাড়াবার ব্যবস্থাও হল। হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরা। শুকনো মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দেয়া। ভয়াবহ ব্যাপার। কোন লাভ হল না। বাবা আমাকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। ঢাকার ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বললেন—আমার যা হয়েছে তার নাম জন্ডিস। খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস। হেপাটাইটিস বি। লিভার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তারদের নাকি করার কিছু নেই। বাবা আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

এক রাতে আমার অবস্থা খুব খারাপ হল। রহিমা খালা কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমি বাবাকে ডেকে বললাম, আমার খুবই খারাপ লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। দম আটকে আসছে। তুমি আমাকে কোলে করে বারান্দায় নিয়ে যাও। খোলা বাতাসে আমি বোধ হয় নিঃশ্বাস নিতে পারব। বাবা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। তবে আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন না। বাড়ির পেছনে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে বড় একটা শিউলি গাছ ছিল। প্রতি বছর এই গাছে অসংখ্য ফুল ফুটতো। বাবা সরাসরি গাছের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে অদ্ভুত একটা কথা বললেন—

বাবা বললেন, টগর তোর যে অসুখ হয়েছে সেই অসুখ সারাবার সাধ্য মানুষের নেই। আমি একটা শেষ চেষ্টা করব। অন্য রকম এক চিকিৎসা। সাধু ধরনের একজন মানুষ এই চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে শোনা। সব চেষ্টাই তো করা হল—এটাও এক ধরনের চেষ্টা।

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, কী চেষ্টা?

'তোকে আমি শিউলি গাছের নীচে বসিয়ে দিব। তুই দুই হাতে শক্ত করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে থাকবি আর মনে মনে বলবি, গাছ তুমি আমার অসুখটা তোমার নিজের শরীরে নিয়ে আমাকে সুস্থ করে দাও। পারবি না?'

আমি বললাম, পারব।

বাবাকে খুশি করার জন্যেই বললাম পারব।

ডুবন্ত মানুষ বাঁচার জন্যে খরকুটো ধরে। বাবাও তাই করছেন। কিছু না পেয়ে গাছের হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছেন। বাবা যে ভাবে গাছ ধরতে বললেন, সেই ভাবে ধরলাম এবং মনে মনে বললাম, হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার নিজের শরীরে নিয়ে আমাকে সুস্থ করে দাও।

==

বাবা বললেন, টগর। তোকে এই যে আমি গাছের সঙ্গে জুড়ে দিলাম আর তুলব না। তুই খুব মন লাগিয়ে গাছকে বল তোকে সারিয়ে দিতে।

আমি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছি। আমার অসম্ভব দুর্বল শরীরে কিছু না ধরে বসে থাকাও সম্ভব না। আমি যা করছি তা যে খুব অস্বাভাবিক কিছু তাও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যা করছি, ঠিকই করছি।

রহিমা খালা বাবাকে বললেন—আপনের কি মাথাটা খারাপ হইছে? আপনে করতাছেন কী? এইটা কেমন চিকিৎসা ? অসুখ হইছে পুলার। মাথা খারাপ হইছে আপনের।

বাবা বললেন, তুমি কথা বলবে না রহিমার মা। একটা কথাও না।

'এই অবস্থায় কতক্ষণ থাকব?'

'জানি না।'

আমার অসুখ এই পর্যায়ের ছিল যে আমি বেশির ভাগ সময়ই ঘোরের মধ্যে থাকতাম। চারপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারতাম না।

গাছ জড়িয়ে ধরার পর পরই আমি ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। প্রবল ঘোর। মাঝে মাঝে ঘোর কমে, আমি আবছা ভাবে দেখি বাবা পাশেই বসে আছেন। আমি যতবারই চোখ মেলি ততবারই বাবা বললেন—কথা বল। গাছের সঙ্গে কথা বল।

আমি ফিস ফিস করে বলি—হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে নিয়ে আমাকে সারিয়ে দাও। হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে নিয়ে আমাকে সারিয়ে দাও। হে গাছ তুমি...

===================================

বাবা আমাকে গভীর রাতে গাছের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। রাত কেটে ভোর হল আমি সেইভাবেই রইলাম। বেলা বাড়তে থাকল। এক সময় মাথায় রোদ এসে পড়ল—আমি নড়লাম না। আমার সময় কাটতে লাগল প্রবল ঘোর এবং প্রবল অবসাদের মধ্যে। আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই বোধ ক্রমেই লুপ্ত হতে থাকল। কেউ যেন আমাকে আমার চেনা জগৎ থেকে খুব ধীরে ধীরে আলাদা করে নিচ্ছে। আমি প্রবেশ করছি অন্য এক ভুবনে। সেই ভুবন ছায়াময়, আনন্দময় এবং নিস্তরঙ্গ জলের মতো শান্ত। সেই জলে ছায়া পড়ে, কিন্তু ছায়া স্থায়ী হয় না। একটা ছায়া মিলিয়ে যায় অন্য ছায়া আসে। নিস্তরঙ্গ জলে চলমান গতিময় জীবন।

এক সময় আমি চোখ মেললাম, দেখলাম সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আকাশে শেষ সূর্যের আলো। আমি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছি। বাবা আমার পাশেই। তাঁর মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, টগর শরীরটা কী একটু ভাল লাগছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে না?'

আমি বললাম, না। কষ্ট হচ্ছে না।

'খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি?'

'হুঁ।'

'শরীরটা কী সত্যি ভাল মনে হচ্ছে?'

'হুঁ।'

বাবা মহাবিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি গাছ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন, একি গাছ ছেড়ে দিলি কেন?

আমি বললাম, আমি ভাল হয়ে গেছি। কথাটা যে আমি নিজে বললাম তা না। আমার ভেতর থেকে অন্য কেউ যেন বলল। দীর্ঘদিন পর প্রথমবারের মতো

==

আমি কারও সাহায্য ছাড়াই নিজে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। জলচৌকিতে বসিয়ে গরম পানিতে আমাকে গোসল করানো হল। রহিমা খালা বার বার বলতে লাগলেন, বড় আচানক ঘটনা। বড়ই আচানক।

আমার জন্যে আলোচালের ভাত এবং শিং মাছ রান্না করা হল। তৃপ্তি করে ভাত খেলাম। আগের মতো বমি করে ভাত উল্টে ফেলে দিলাম না।

বাবা বললেন, এখনও কি ক্লান্ত ভাব আছে ?

আমি বললাম, আছে।

বাবা বললেন, চল যাই গাছ জড়িয়ে ধরে বসে থাক। একটু কষ্ট কর।

আমি বললাম, আর গাছ জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে হবে না। আমি সেরে গেছি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমাব।

বাবা আমাকে শুইয়ে দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। এমন শান্তিময় ঘুম আমি আগে কখনো ঘুমাই নি। ভবিষ্যতেও যে ঘুমাব তা মনে হয় না। যেন আমার শরীর পাখির পালকের মতো হয়ে গেছে। সেই পালক ভেসে বেড়াচ্ছে হিম হিম হাওয়ায়। সেই গভীর শান্তিময় ঘুমে আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। গহীন কোনো বনের ঠিক মাঝামাঝি আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার চারপাশে গাছ। সেই গাছের শাখা প্রশাখা প্রায় আকাশ স্পর্শ করছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি স্থির হয়ে। আমার নিজেকেও একটা গাছের মতই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন। সমস্ত বনভূমি শব্দহীন। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপার শব্দও আসছে না। যেন সমগ্র বনভূমি কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটবে। সবাই অপেক্ষা করছে বিশেষ সেই ঘটনার জন্যে।

বিশেষ ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলল, কোন একটি বিশেষ গাছ না—বনভূমির সব গাছই কথা বলল। প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, তাদের চিন্তা ভাবনা আলাদা। গাছরা সে রকম না। তারা সবাই মিলে এক। তাদের সবার চিন্তা ভাবনাই এক। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি লতা ও গুল্ম একে অন্যের অংশ। গাছরা বলল, তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ ?

আমি বললাম, পাচ্ছি।

'তুমি কি বুঝতে পারছ—এখন তুমি আমাদেরই একটা অংশ ?'

'বুঝতে পারছি।'

'আমরা তোমার রোগ নিয়ে নিয়েছি।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।'

==

'সেই সঙ্গে আমরা আমাদের একটা অংশও তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এছাড়া অন্য উপায় ছিল না।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন তুমি পুরোপুরি মানুষ নও।'

'আমি কি এখন গাছ ?'

'না তুমি গাছও নয়। গাছদের চেতনার একটা অংশ তোমার মধ্যে চলে গেছে। সেটা যে খুব আনন্দময় তা-না।'

'ও আচ্ছা।'

'চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাকে আমাদের ক্ষমতার কিছু অংশও তোমাকে দিলাম। বলতে পার তোমার জন্যে এ হল আমাদের সামান্য উপহার।'

'আপনাদের কি অনেক ক্ষমতা ?'

'হ্যাঁ আমরা মহাশক্তিধর। আমরা এই পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করি। মানুষ তা বুঝতে পারে না। তবে এখন থেকে তুমি খানিকটা বুঝতে পারবে। ভাল কথা, কিছুটা কি বুঝতে পারছ না ?'

'পারছি।'

'নতুন জীবনের শুরুতে তোমার কষ্ট হবে। নিজেকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ মনে হবে। তবে এক সময় সেই কষ্ট সহনীয় হয়ে যাবে। তাছাড়া তুমি নিঃসঙ্গ নও।'

'আমার মতো কি আরো অনেক আছে ?'

'না, অনেক নেই। খুব অল্প সংখ্যকই আছে। গাছের চেতনার অংশ সবাইকে দেয়া হয় না। কাউকে কাউকে দেয়া হয়।

আমার স্বপ্ন এইখানেই শেষ হল। সাধারণত অদ্ভুত বা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখার পরপরই ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমার ঘুম ভাঙ্গল না—আমি আরো আনন্দময় ঘুমের ভুবনে তলিয়ে গেলাম। কোথায় যেন অপার্থিব সুরে গান হচ্ছে। আমি কিছু শুনতে পারছি আবার কিছু পারছি না।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙ্গল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বা মানুষ না অন্যকিছু হিসেবে। শরীরে কোন রোগ নেই। কোন ক্লান্তি নেই।

বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বাবা বললেন, কিরে তোর শরীরটা এখনও ভাল তো ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, অদ্ভুত কাণ্ড। শিউলি গাছটা মনে হয় মারা যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছি। বেশির ভাগ পাতা হলুদ হয়ে গেছে। তোর অসুখ গাছটা সত্যি সত্যি নিয়ে নিয়েছে। জগৎ বড়ই রহস্যময়।

==

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি বুঝতে পারছি—জগৎটা বাবার কাছে যতটা রহস্যময় মনে হচ্ছে এই জগৎ তার চেয়েও অনেক অনেক রহস্যময়।

এই মুহূর্তে আমি নতুন এক রহস্যের মুখামুখি হয়েছি। কারণ আমি বাবার মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তিনি কি ভাবছেন, না ভাবছেন তা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারছি। বাবা বললেন, কিরে তুই এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ? কী দেখছিস ?

আমি কিছুই দেখছি না, আবার অনেক কিছুই দেখছি।

'এই টগর তুই এইভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে ? শরীর খারাপ লাগলে বোস।'

আমি বসলাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম। এবং বাবা কি ভেবেছেন তা জানতে লাগলাম। কাজটা কি অন্যায় হচ্ছে? হয়ত হচ্ছে। বাবা ভাবছেন—তাঁর মেয়ের কথা। তাঁর সমস্ত অন্তর কাঁদছে। সেই কান্না ভয়াবহ কান্না। তিনি ভাবছেন—আহারে আজ যদি আমার মেয়েটা বেঁচে থাকত। দুই ভাই বোন মিলে কত আনন্দই না করত। তার পরপরই তিনি ভাবলেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর কথা—আমার মা'র কথা। এই প্রথম বাবার চিন্তায় আমি আমার মা'কে স্পষ্ট দেখলাম। মা'র চেহারাটা তো খুব সুন্দর ছিল। তবে গায়ের রঙ কাল আমি ভেবেছিলাম, মা বোধ হয় ফর্সা ছিলেন।

'টগর!'

'কী বাবা ?'

'তুই আমার দিকে এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন ?'

'এম্নি।'

আমি এখন অবাক হয়ে বাবার মনের ভেতরে আরেকটি ব্যাপার দেখছি—এখন তিনি আর আমার মা'র কথা ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন—শিউলি গাছটার কথা। আহা গাছটা মরে যাচ্ছে। কঠিন এক অসুখ শরীরে নিয়ে মরে যাচ্ছে। বেচারা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে।

আমি দেখলাম, বাবার চোখ ছল ছল করছে। বাবার মতো ভবঘুরে মানুষের অন্তরটা যে এত ভাল তা এই প্রথম বুঝলাম।

নতুন জীবনে আমি অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। কোনদিন পারব বলেও মনে হচ্ছে না। নিজের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। কারো সঙ্গে

==

কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। অবশ্যি কথা বলার প্রয়োজনও আমার কমে গেছে। আমি মানুষের মনের কথাতো বুঝতেই পারছি।

আমার ক্ষুধাবোধ, তৃষ্ণাবোধও কমে গেল। রোদে যখন দাঁড়াই আমার ভাল লাগে। খোলা প্রান্তরে দাঁড়ালে ভাল লাগে। ঘরের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে বিশাল এক অশ্বত্থ গাছ ছিল। কি কারণে জানি গাছটাকে সবাই ডাকত মান্দালের গাছ। রোজ এই গাছের কাছে যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেল। বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গাছের কাছে যাই। সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকি। সন্ধ্যাবেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি গাছে ফিরে আসে। তারা কিচির মিচির করে চারদিকে হৈ চৈ ফেলে দেয়। আমি সন্ধ্যা হওয়া দেখি, পাখিদের কিচির মিচির শুনি, এবং মাঝে মাঝে গাছের সঙ্গে কথা বলি। বটবৃক্ষ জানতে চায়—তোমার মন অস্থির কেন?

'জানি না কেন?'

'মন সুস্থির কর। অস্থিরতা কোন কাজের কথা না।'

'মন সুস্থীর করতে পারছি না। সব এলোমেলো লাগছে। আমাকে তোমরা এ রকম বানিয়ে দিলে কেন?'

'এই অবস্থাটা কি তোমার ভাল লাগছে না?'

'না। আমাকে আগের মতো বানিয়ে দাও।'

'সেটা সম্ভব না।'

'তাহলে পুরোপুরি গাছ বানিয়ে দাও। সেটা কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ তা সম্ভব।'

'কোন মানুষকে কি পুরোপুরি গাছ বানানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে। তবে সংখ্যায় খুব কম।'

'তারা কি সুখী হয়েছে?'

'তাদের অস্থিরতা কমেছে। অস্থিরতা কমার ভেতরই সুখ। তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে—জ্ঞান বৃদ্ধিতে সুখ। তাদের ক্ষমতা অনেক অনেক বেড়েছে। ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সুখ। পরিপূর্ণ সুখ অলিক কল্পনা ছাড়া কিছুই না, একমাত্র বৃক্ষই পরিপূর্ণ সুখের কাছাকাছি বাস করে। মানুষ যে অমরত্ব চায় একমাত্র গাছের কাছেই আছে সেই অমরত্ব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত চেতনার বিলুপ্তি ঘটে। বৃক্ষের ব্যক্তি চেতনা নেই। তার হল সমষ্টি চেতনা। সেই চেতনার মৃত্যু নেই বলেই বৃক্ষ অমরত্বের দাবী করে।'

==

আমি না মানুষ, না বৃক্ষ হয়ে বাস করতে লাগলাম। আমার আবেগ কমে গেল। অভিভূত হবার ক্ষমতা চলে গেল। প্রবল দুঃখেও আমার চোখে পানি আসে না। প্রবল আনন্দেও উল্লাসিত বোধ করি না। বাবা আমাকে নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন—তোর কি হয়েছে বলতো ? অসুখটা তো মনে হয় পুরোপুরি সারে নি। শরীরের অসুখ সারলেও মনে হয় তোর মনে কোন অসুখ ঢুকে গেছে। চল ঢাকায় যাই—তোকে বড় একজন ডাক্তার দেখাই। আমি বললাম, চল।

ঢাকায় নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেক ডাক্তার-টাক্তার দেখানো হল। তাঁরা বললেন—সমস্যা কিছু আছে। হার্টবিট স্বাভাবিকের চেয়েও বেশ কম, ব্লাড প্রেসার কম—তবে তেমন গুরুতর কিছু না। অনেকের হার্টবিট জন্ম থেকেই কম থাকে, প্রেসারও কম থাকে। এর বেলাতেও হয়ত তাই।

বাবা খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন এবং তার পাঁচ দিনের মাথায় এক দুপুরে কোন অসুখ বিসুখ ছাড়াই হুট করে মারা গেলেন। আমার কোন রকম দুঃখ বোধ হল না। বরং মনে হল ভালই তো হয়েছে। আমার আর কোন পিছুটান থাকল না—এখন নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে পারি—যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারি।

নতুন এক ধরনের জীবন যাত্রা আমার জন্যে শুরু হল। বেশীর ভাগ সময় লোকালয়ের বাইরে থাকি মাঝে মাঝে লোকালয়ে ফিরে আসি। জীবিকার জন্যে ম্যাজিক দেখাই। ম্যাজিক দেখানোর জন্যে আমার কিছুই লাগে না। আমি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারি। আমি হাতে একটা মাটির দলা নিয়ে যদি মনে মনে ভাবি—এটা মাটির দলা না, এটা সুন্দর গোলাপ ফুল—সবাই সেটাকে গোলাপ ফুলই দেখে। শুধু যে দেখে তাই না, গোলাপের সৌরভও পায়।

মাঝে মাঝে আমি হতাশাগ্রস্থ হই তখন গাছরা আমাকে সান্তনা দেয়। তারা বলে—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলি, যদি ঠিক না হয় ?

'তাহলে আমরা তোমাকে পুরোপুরি বৃক্ষ বানিয়ে দেব।'

'তোমরা আমার ভেতর তোমাদের অংশ ঢুকিয়ে দিলে কেন ?'

আমরা যা করেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য করেছি। মানবজাতি শুরু থেকে এই পর্যায়ে যে এসেছে তার প্রতিটি ধাপে আমরা তাদের সাহায্য করেছি। এখনো করছি। মানুষ তার রোগ, জড়া, ব্যাধির ওষুধ গাছ থেকে পেয়েছে। আমরা তাদের বলে দিয়েছি এই গাছের এই ফলটি ব্যবহার কর, বা শিকড়

===

ব্যবহার কর। মানুষ ব্যবহার করেছে এবং পরে ভেবেছে এইসব আবিষ্কার সে নিজে নিজে করেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার ব্যাপারে আমরা যা করেছি তা ছাড়া তোমাকে বাঁচানোর কোন উপায় ছিল না।'

এই জীবন কি আমি চেয়েছিলাম?

অর্ধেক মানুষ। অর্ধেক গাছ। কোন কিছুর সঙ্গেই আমার যোগ নেই, আবার সব কিছুর সঙ্গেই যোগ আছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ জীবন অসহ্য বোধ হয়। আবার এই জীবনটা ভালও লাগে। কখনো কখনো পুরোপুরি গাছ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছা করে গভীর বনের মাঝখানে কদম গাছ হয়ে থাকি। বর্ষায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে নিজের মনে বৃক্ষদের মহা-সংগীত গাই। এ এক আশ্চর্য এবং অদ্ভুত জীবন।

==

সকাল থেকেই সুপ্তির খুব মন খারাপ।

মন খারাপ হবার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে খুব বড় কিছু ঘটবে। ভয়ংকর কিছু। সেই ভয়ংকর কিছুটা কী তা সে জানে না। কেউ কি মারা যাবে? এ বাড়ির একমাত্র অসুস্থ মানুষ তার নানীজান খাদিজা বেগম। তিনি বেশ সুস্থ। রাত্রে সুপ্তি তাঁর সঙ্গে ঘুমায়। তিনি মহানন্দে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করেন। মানুষ হুট-হাট করে মারা যায় ঠিকই কিন্তু নানীজান হুট করে মারা যাবেন সুপ্তির তা মনে হয় না। তাহলে এত মন খারাপ লাগছে কেন? সুপ্তি কারণটা ধরতে পারছে না। সে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার নিজের ঘরে ঢুকল। ঘর-বাড়িগুলি কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। এরকম তার কখনো হয় না, আজ হচ্ছে কেন?

সুপ্তি বাড়ির পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। নিজের বাড়িতে সে যত স্বাভাবিকভাবে ঘুরতে পারে এ বাড়িতে পারে না। প্রতিদিনই জায়গাটা তার নতুন লাগে। বাড়ির উঠোনে একটা ডালিম গাছ আছে, এই ডালিম গাছটাও যেন জায়গা বদলায়।

সুপ্তির নানীজান খাদেজা বেগম লক্ষ্য করলেন সুপ্তি তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন—মাইয়া কই যায়?

'পুকুর পাড়ে যাই নানীজান।'

'কী সর্বনাশ, একলা একলা ক্যামনে যাবি?'

'পারব নানীজান।'

'আয় আমি লইয়া যাই।'

নানীজান এসে হাত ধরলেন। কেউ হাত ধরে তাকে টেনে টেনে নিয়ে গেলে তার খুব খারাপ লাগে। নিজেকে অন্ধ অন্ধ লাগে। যদিও সে অন্ধ, তারপরেও অন্ধ অন্ধ লাগাটা কুৎসিত। একমাত্র নানীজান হাত ধরলে খারাপ লাগে না।

'পুসকুনি তোর ভাল লাগে রে মাইয়া?'

'খুব ভাল লাগে।'

==================================

'আমারও লাগে। নয়া বউ হইয়া যখন এই বাড়িত আসি তখন কী করতাম জানস?'

'না জানি না। কী করতেন?'

'পুসকুনির পাড়ে বইয়া বইয়া খালি কানতাম। আর তোর নানাজান রাগ ভাঙ্গাইয়া আমারে ঘরে আনত। একদিন কী হইছে শোন, আমার রাগ আর ভাঙ্গে না। শেষমেষ তোর নানাজান আমারে কোলে কইরা আনা ধরছে—হঠাৎ দেখা হইল আমার শাশুড়ির সাথে। তোর নানাজান ধপাস কইরা আমারে ফেলাইয়া দিল। হি হি হি।'

'নানাজান তোমাকে খুব ভালবাসত?'

'ওমা ভালবাসব না? কী কস তুই?'

'এত ভালবাসতো তাহলে পুকুর পাড়ে বসে তুমি কাঁদতে কেন?'

'কানতাম যাতে তোর নানাজান আইস্যা আমার কান্দন থামায়। হি হি হি। তখন আমার বয়স ছিল কম। দুষ্টু বুদ্ধি ছিল বেশি।'

'তোমার বয়স কত ছিল নানীজান?'

'তের বছর।'

'ও আল্লা আমারও তো তের বছর বয়স। কিন্তু নানীজান আমি পুকুর পাড়ে বসে যতই কাঁদি, আমার কান্না থামানোর জন্যে নানাজানের মতো কেউ আসবে না।'

খাদিজা বেগম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং হঠাৎ লক্ষ্য করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তাঁর এই নাতনীটিকে তিনি খুব পছন্দ করেন। এত পছন্দ তিনি এই জীবনে কাউকে করেছেন বল তাঁর মনে পড়ে না।

'নানীজান!'

'কী গো মাইয়া।'

'আমি তোমার খুব মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি তাই না? তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমার চোখে পানি। আমার কারোর মন খারাপ করতে ইচ্ছা করে না। তারপরেও নিজের অজান্তেই সবার মন খারাপ করিয়ে দেই। আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছা করে জান?'

'কী ইচ্ছা করে?'

'ইচ্ছা করে তোমাদের এই পুকুরটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাই। একবার সাহস করে পড়তে পারলে তোমরা শুরুতে প্রচণ্ড কষ্ট পেলেও পরে আর কষ্ট পেতে না।'

সুপ্তি কাঁদছে। অনেক দিন পর ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। নানীজান তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েও তাকে শান্ত করতে পারছেন না।

কি-যে সুপ্তির হল সে সারাদিনই কাঁদল। নানীজান রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেলেন। এবং তিনি লক্ষ্য করলেন—সুপ্তি বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুপ্তি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যদিও তার কাঁদার কথা না—কারণ সে খুব আনন্দময় একটা স্বপ্ন দেখছে। আনন্দময় স্বপ্ন দেখেও মানুষের চোখে পানি আসে। তারও হয়ত তাই হচ্ছে। সে দেখছে যেন ম্যাজিক ভাইয়া তার সামনে বসে আছেন। হাসছেন।

'ম্যাজিক ভাইয়া আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল আছি।'

'আপনি কি জানেন আজ আমি সারা দিন কেঁদেছি।'

'জানি।'

'কীভাবে জানেন?'

'আমি জানব না কেন? আমি যাদুকর না?'

'আমি এখনও কাঁদছি আর আপনি হাসছেন?'

'তোমার কান্না থামার ব্যবস্থা করেছি বলেই হাসছি—তোমার যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গবে তখন আর কান্না থাকবে না।'

'কেন?'

'আমি তোমার জন্যে অসাধারণ একটা ম্যাজিকের ব্যবস্থা করেছি। তোমার ঘুমের মধ্যেই ম্যাজিকটা ঘটবে। ম্যাজিকটা হল তোমার জন্যে আমার উপহার।'

'আপনার গলার স্বরটা এমন করুণ শুনাচ্ছে কেন?'

'আমার মনটা খুব খারাপ এই জন্যেই বোধহয়।'

'মন খারাপ কেন?'

'তাতো তোমাকে বলব না।'

সুপ্তির ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরে। ফজরের আজান হয়ে গেছে। ঘরে সামান্য আলো এসেছে। সুপ্তি বিছানা থেকে নামল। তার মনে হচ্ছে সে যেন অন্য কোথাও চলে এসেছে। সব কিছুই কেমন এলোমেলো—কেমন অপরিচিত। যে খাটটা থেকে সে নেমেছে সেই খাটটা অপরিচিত। যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘর অপরিচিত। তার শরীরও যেন কেমন ঝিম ঝিম করছে। কিছু একটা ঘটেছে, কী ঘটেছে সে বুঝতে পারছে না। সুপ্তি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কয়েক

মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল। সুরমা নামাজ ফেলে ছুটে এলেন। সুপ্তি মা'র দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে—আমি চোখে দেখতে পারছি। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক। আমি সহ্য করতে পারছি না। পৃথিবীটা এত সুন্দর কেন মা?

সুরমা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। সুপ্তি জ্ঞান হারিয়ে মা'র কোলে এলিয়ে পড়ল।

পরিশিষ্ট

অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। সুপ্তির বিয়ে হয়েছে। তাদের একটা বাবু হয়েছে। তারা বাবুর নাম রেখেছে টগর। টগরকে নিয়ে সুপ্তিকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। খুবই দুষ্ট ছেলে। সুপ্তির জীবন হয়েছে আনন্দময়। সে সারাক্ষণই গভীর বিস্ময় এবং গভীর আনন্দ নিয়ে তার চারপাশের জগৎ দেখে। সামান্য একটা পোকাও যদি তার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় সুপ্তি চেঁচিয়ে বলে—টগর দেখে যাও, দেখে যাও কী সুন্দর একটা পোকা।

মাঝে মাঝে সুপ্তি একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখে—যেন গভীর একটা বন, সেই বনে একটা কদম গাছ। এই গাছটা অন্য গাছগুলির চেয়ে আলাদা। অন্য গাছগুলি চোখে দেখতে পায়—এই গাছটা পায় না। কারণ এই গাছ তার দু'টো চোখ একটা মানুষকে দিয়ে দিয়েছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নের মানে কী সুপ্তি বুঝতে পারে না।